কলিকাতাস্থ সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্টবুক কমিটি কর্ত্তৃক মধ্য বঙ্গ বিদ্যালয়ের
তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্যরূপে অনুমোদিত।

হিতকথা।

গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী বি. এল্.

প্রণীত।

চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীকেদারনাথ বসু, বি. এ. কর্ত্তৃক প্রকাশিত
৬৪ নং অখিল মিস্ত্রীর লেন—কলিকাতা।

১৯০১।

PRINTED BY H. D. GHOSE, AT THE HINDU MACHINE PRESS,

64, AKHIL MISTRY'S LANE, CALCUTTA.

হিতকথা

উপক্রমণিকা।

তোমরা এখন এদেশে যেরূপ শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত দেখিতে পাও, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। পূর্ব্বে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বিনা বেতনে, গুরুগৃহে থাকিয়া, বিবিধ শাস্ত্রের উপদেশ লাভ করিতেন। প্রায় পঞ্চম বৎসর বয়সের সময়েই সেই প্রাচীন-কালের শিশুগণের বিদ্যারম্ভ হইত। শৈশবেই তাঁহারা মাতা পিতা ভাই ভগিনীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া গুরুগৃহে বিদ্যাশিক্ষার্থ গমন করিতেন। অবস্থা যাঁহার যেরূপ হউক না কেন,—শিক্ষার্থী রাজপুত্রই হউন, কিম্বা দরিদ্রপুত্রই হউন, গুরুগৃহে তাঁহাদিগের একত্র একভাবেই থাকিতে হইত। গুরুও তাঁহাদিগের অবস্থা-নির্ব্বিশেষে শিক্ষাপ্রদান করিতেন। সেখানে তাঁহাদিগের ভোগ-বাসনা সমস্তই পরিত্যাগ করিতে হইত। কি আহারের আনন্দ, কি বসনের বিলাস, শিক্ষার্থী শিশু ইহার কিছুতেই আশ্রয় পাইতেন না। গুরু যাহা ভোজনে অনুমতি করিতেন, শিষ্য তাহাই ভোজন করিতেন; গুরু যাহা পরিধান করিতে বলিতেন, শিষ্য তাহাই পরিতেন। ফলতঃ সে সময়ে শিক্ষার্থিগণ সর্ব্বতোভাবেই গুরুর অনুবর্ত্তী হইয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন।

গুরুও তখন শিষ্যগণকে অপত্যনির্ব্বিশেষে শিক্ষা প্রদান করিতেন। তখন শিক্ষকগণ শিষ্যবর্গের পরিণামের মঙ্গলের দিকে চাহিয়া শিক্ষাপ্রদান করিতেন। সংসারে কি করিলে ধর্ম্ম প্রতিপালিত হইবে, প্রাচীনকালের আর্য্যগুরু সর্ব্বদা শিষ্যের জন্য তাহাই ভাবিতেন। তাই, সেকালের শিক্ষাপ্রণালী কিছু ভিন্ন রকমের ছিল।

সেই প্রাচীনকালের পরম পূজ্য ঋষিগণ শিষ্যবর্গের শিক্ষার প্রতি যেরূপ লক্ষ্য রাখিতেন, বোধ হয় এখন তোমাদের মাতা পিতাও তোমাদের শিক্ষার প্রতি সেরূপ দৃষ্টি রাখিতে পারেন না। তখন বিদ্যাশিক্ষার সহিত শিক্ষার্থীর চরিত্রও সুন্দররূপে গঠিত হইত। সুখলাভের জন্য সংসারে কষ্টসহিষ্ণুতা, ক্ষমা, তিতিক্ষা প্রভৃতি যে সকল গুণশিক্ষা আবশ্যক—সেই সকল গুণই প্রায় জ্ঞানী গুরু স্বকীয় শিষ্যগণকে অভ্যাস করাইতেন। মন্বাদি শাস্ত্রের উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিলে, সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষা প্রভাবে তখনকার শিষ্যগণ সর্ব্বপ্রকার কষ্টসহিষ্ণু, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, পরোপকারী, অহঙ্কারশূন্য, দয়াশীল, সূক্ষ্মদর্শী এবং সর্ব্বজনের প্রতি যথোচিত ব্যবহারজ্ঞ হইয়া গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগমন করিতে পারিতেন।

বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী সংশোধন করিয়া যে এখন সেই-রূপ শিক্ষাপ্রদান করা যাইতে পারে, এরূপ সম্ভাবনা নাই। বিদ্যালয়ে যাহা শিখিতেছ, এখন তাহাই তোমাদিগকে শিখিতে হইবে; নতুবা সংসারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। তবে যদি সংসারে সুখলাভের প্রত্যাশা কর, তবে সেই প্রাচীন কালের

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

এই স্কুলপাঠ্য পুস্তকখানি কিছু নূতন রকমের হইয়াছে। এই শ্রেণীর পুস্তকে যে ভাবে নীতি-উপদেশ লিখিত থাকে, এই পুস্তকে ঠিক তেমন ভাবে উপদেশগুলি লিখিত হয় নাই। আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির নীতিগুলি এক ভাবে সম্পূর্ণ করিতেই চেষ্টা করিয়াছি। এই নীতিগুলির মধ্যে এমনই একটা শৃঙ্খলা বিদ্যমান রহিয়াছে যে, প্রবন্ধগুলি আপাততঃ বিচ্ছিন্ন বোধ হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে পরস্পর বিশেষ সম্বন্ধযুক্ত। পুস্তকখানি পড়িলেই সেই সম্বন্ধ উপলব্ধি হইবে, ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস। তবে যাঁহারা অগ্রে বিজ্ঞাপনেই পুস্তকের উদ্দেশ্য ও মর্ম্মাদির কথা জানিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে সেই সম্বন্ধ বিজ্ঞাপনেই বুঝাইবার জন্য কয়েকটি কথা এখানে বলিতেছি।

আমরা উৎকৃষ্ট সুখপ্রাপ্তিকে মানবজীবনের মুখ্য লক্ষ্যস্বরূপে গ্রহণ করিয়া, তাহা পাইবার জন্য মানবের কিরূপ শিক্ষা, কিরূপ কার্য্য আবশ্যক, তাহাই যথাসম্ভব এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে আলোচনা করিয়াছি। জীবনের এইরূপ লক্ষ্য গ্রহণে, কোন সংপ্রদায়েরই আপত্তি হইতে পারিবে না, আমাদিগের এইরূপই বিশ্বাস। হিন্দুগণের মধ্যে যাঁহারা উচ্চাধিকারী, তাঁহারা সুখ ও দুঃখ উভয়ের ত্যাগই আদর্শ মানবের কার্য্য, এইরূপ বলিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহারাও, নিম্নাধিকারিগণকে উৎকৃষ্ট সাত্ত্বিক সুখের চেষ্টা করিতে পরামর্শ দিলে, তাহাতে আপত্তি করিবেন এমন বোধ হয় না। Honesty is the best policy এই নীতিবাদিগণও ইহাতে তাঁহাদিগের মত অনুসরণ করা হইয়াছে দেখিতে পাইবেন। ফলতঃ আমাদিগের বোধ হয়, এই লক্ষ্য নির্দ্দেশে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সকল শ্রেণীর সকল লক্ষ্যই বজায় রাখা হয়।

এইরূপে শ্রেষ্ঠ সুখকে জীবনের লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া, আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে [illegible]

কতকগুলি শিক্ষা বিশেষ আবশ্যক। আমি প্রথম পরিচ্ছেদে শরীর সম্বন্ধীয় কতকগুলি শিক্ষার বিষয় বলিয়াছি। এই সকল শিক্ষা সবিস্তারে স্কুলপাঠ্য পুস্তকে বলা অসম্ভব—আমি ইহা ছাত্রপাঠোপযোগী করিয়াই বলিতে চেষ্টা করিয়াছি।

শরীর ও মনের সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা ভিন্ন উৎকৃষ্ট সুখলাভার্থ সংসারীর আর যাহা যাহা আবশ্যক, তাহারই দুই চারিটি বিষয় তৃতীয় পরিচ্ছেদে বলিয়াছি। চতুর্থ পরিচ্ছেদে কয়েকটি মহৎ লোকের মহতী কাহিনী বর্ণনা করিয়াছি। যথাসাধ্য এই লোকগুলি ভিন্ন ভিন্ন দেশ, সম্প্রদায় ও জাতি হইতে নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছি। হিন্দুগণের পৌরাণিক কোন আখ্যান গ্রন্থমধ্যে স্থান পায় নাই, কারণ হিন্দু ভিন্ন অপর ধর্ম্মাবলম্বিগণের তাহাতে আপত্তি হইতে পারে।

প্রবন্ধগুলির সম্বন্ধ দেখিয়া এবং পুস্তকের উদ্দেশ্যের কথা শুনিয়া গ্রন্থখানিকে আপাততঃ কঠিন ও ছাত্রপাঠের অনুপযোগী বলিয়া ধারণা হইতে পারে। কিন্তু আমাদিগের বিশ্বাস পুস্তকখানি পড়িলে সে ধারণা থাকিবে না। আমি উপদেশগুলি যথাসাধ্য বিশদ ও কার্য্যোপযোগী Practical করিতে চেষ্টা করিয়াছি। একটা দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। ক্রোধ সম্বন্ধে আমাদিগের কর্ত্তব্য লিখিবার সময় 'ক্রোধ করা ভাল নহে' এই কথা এবং ক্রোধের দোষ দেখাইয়াই আমরা বিরত হই নাই; যাহাতে এই ক্রোধের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করা যায়, তাহার উপায় লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি। ফলতঃ পুস্তকখানিকে ছাত্রপাঠ্য করিতে আমাদিগের চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই, তবে যাহা ক্ষমতাতীত, তাহা চেষ্টা করিলেও সম্পন্ন করা যায় না।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়ন জন্যও আমরা অনেকের নিকট সাতিশয় ঋণী হইয়াছি। ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর C. I. E.র নাম সেই মহাজনগণের তালিকায় সর্ব্বপ্রথমে স্থাপন করিতে হয়। আমরা সকল

বিষয়েই তাঁহার নিকট ঋণী—সুতরাং বিষয় প্রকাশ করিয়া তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে পারিতেছি না। ফলতঃ এই ক্ষুদ্র স্কুলপাঠ্য গ্রন্থখানিতে একভাবে তাঁহারই শিক্ষা প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছি। শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের নিকটেও আমি সাতিশয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। মহৎলোকের মহৎ কাহিনী লিখিতে আমি তাঁহার পুস্তক হইতে নানাপ্রকার সাহায্য পাইয়াছি। তিনি এ সম্বন্ধে আমাকে দুই তিনখানি পুস্তক প্রদান করিয়াও উপকার করিতে ত্রুটি করেন নাই। এসম্বন্ধে তাঁহার উদারতা বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

ঢাকার নবাব আবদুল গণিজ ফ্রি এণ্ট্রান্স স্কুলের হেড্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ সেনগুপ্ত মহাশয় এই পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত প্রুফ দেখিয়া দিয়াছেন। আধুনিক লেখায় যেরূপ ব্যাকরণ দোষ চলিয়া থাকে, ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থে সেরূপ কোন দোষ না থাকে, তাহা করিতে তিনি বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন ; এই জন্য তাঁহার নিকটেও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিত বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত ও শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিত শিবাজীর জীবনবৃত্তান্ত হইতে আমি কয়েকটি ঘটনা গ্রহণ করিয়াছি ; তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায়।

তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

"হিতকথা" সংশোধিত হইয়া পুনর্ব্বার প্রকাশিত হইল। 'এই পুস্তকের স্থানে স্থানে ভাষার দোষ আছে, দুই চারি স্থানে অসত্য কথা (inaccurate expression) আছে'—এই বলিয়া আপত্তি উত্থাপিত হওয়াতে, গত বৎসর সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্ট বুক কমিটি ইহাকে বালকগণের পাঠোপযোগী গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হয়েন নাই। যথাসাধ্য সেই সকল দোষ বিদূরীত করিয়া, পুনর্ব্বার গ্রন্থখানি প্রোক্ত কমিটিতে প্রদান করা গেল।

এই সংশোধন কার্য্যে আমি প্রোক্ত সভার দুইজন পরম শ্রদ্ধাস্পদ সভ্যের নিকটে সহায়তারূপ অনুগ্রহপ্রাপ্ত হইয়াছি। সর্ব্বথা পূজনীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্, এ, মহাশয় পুস্তকখানির আদ্যো-পান্ত পাঠ করিয়া ইহার দোষগুলি দেখাইয়া দিয়াছেন এবং স্থলবিশেষে তাহা সংশোধনও করিয়া দিয়াছেন। পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, বি, এল্ মহাশয়, ইহার কতকাংশ বিশেষরূপে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের এই সহায়তাবলেই আমি গ্রন্থখানি এইরূপ সংশোধন করিতে সমর্থ হইয়াছি। তাঁহাদিগের নিকটে এই জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম।

আরও একটি কথা এইবারে বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। কথাটি পূর্ব্বের বিজ্ঞাপনেও বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তাহা সংক্ষেপে লিখিত ছিল।

"হিতকথায়" বালকদিগকে যাহা করিতে উপদেশ দিয়াছি, 'সুখের জন্য তাহা অনুষ্ঠেয়' এইরূপই আমি প্রকাশ করিয়াছি। এ কথায় তর্ক উঠিতে পারে যে, সুখের উদ্দেশ্যে কার্য্যানুষ্ঠানের উপদেশ হিন্দুর নিষ্কাম ধর্ম্ম-বিহিত নহে, অতএব তাহা এই গ্রন্থে নিবিষ্ট করা অন্যায্য হইয়াছে। এই তর্কের উত্তরে আমি এই স্থলেই দুই চারিটি কথা বলিয়া রাখি।

সুখের উদ্দেশ্যে কার্য্যানুষ্ঠান হিন্দুর নিষ্কাম ধর্ম্মবিহিত নহে, একথা স্বীকার করিলেও, ধর্ম্মবিহিত সুখ বা সাত্ত্বিক সুখের উদ্দেশ্যে কার্য্যানুষ্ঠান হিন্দুধর্ম্ম বিরুদ্ধ, একথা আমি স্বীকার করিতে পারি না। আমার ইহাই মনে হয় যে, অজ্ঞানীকে এবং বালকদিগকে সকাম বা সুখের উদ্দেশ্যে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে হিন্দুশাস্ত্রে উপদেশ দিয়াছেন। ইহা সপ্রমাণ করা সহজসাধ্য বলিয়াই আমার মনে হয়। আবার এদিকে প্রচলিত ব্যবহারাদিও দেখুন। হিন্দুর প্রধান ক্রিয়া দুর্গোৎসবাদির সংকল্প সকাম। আয়ু, ধন, যশ, ভাগ্য ইত্যাদি পাইবার প্রার্থনা হিন্দু-ধর্ম্মানুষ্ঠানে অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার তাৎপর্য্য আমি এই মনে করি যে, সুখভোগের বাসনা প্রথমেই একেবারে পরিত্যাগ করা সম্ভব নহে ভাবিয়া, অত্যল্প দুঃখমিশ্রিত সুখকে অর্থাৎ যাহাকে শাস্ত্রে সাত্ত্বিক সুখ বলা হইয়া থাকে এবং যাহাকে আমি উৎকৃষ্ট সুখ বলিয়া অভিহিত করিয়াছি সেই সুখকে—লক্ষ্য করিয়া প্রথমে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হিন্দুশাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন। পরে জ্ঞান জন্মিলে, অধিকারী হইলে, এবম্বিধ সুখকেও পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কাম ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে ব্রতী হইতে হিন্দুশাস্ত্রে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এ সুখও পরিত্যাজ্য —কেন না, ইহাতেও দুঃখ আছে—যাহাতে দুঃখের একেবারে নিবৃত্তি হয়, তাহারই অনুষ্ঠান শ্রেয়স্কর। নিষ্কাম ধর্ম্মে তাহাই হয়। তাই নিষ্কাম ধর্ম্মের এত শ্রেষ্ঠতা। নিষ্কাম ধর্ম্ম সুখের জন্য, এ কথায় বরং আপত্তি করিলে চলে, কেন না, এই 'সুখ' কথায় পূর্ব্বোক্ত সুখেরই ধারণা জন্মাইয়া থাকে। কিন্তু নিষ্কাম ধর্ম্ম আনন্দ-লাভের জন্য—ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। অধিকারীভেদে কর্ত্তব্যের বিভিন্নতার উপদেশ হিন্দুধর্ম্মেরই একটা বিশেষত্ব।

আমার লিখিত নীতিগুলিতে যদি অন্য দোষ না থাকে, তবে নিশ্চয়ই ভরসা করি, 'সুখের উদ্দেশ্যে তাহা অনুসরণীয়' এ কথায় বিশেষ দোষ হইবে না। 'দুঃখ-নিবৃত্তি এবং সুখ-প্রাপ্তিই পুরুষকারের লক্ষ্য' একথা

অনেক হিন্দুগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। "লেখাপড়া করে যেই, গাড়ী-ঘোড়া চড়ে সেই" "লেখাপড়া যেই জানে, সর্ব্বলোকে তারে মানে" এ কথাগুলিও পাঠ্যপুস্তকে চলিত আছে। এস্থলে গাড়ী ঘোড়ায় চড়িবার জন্য, সম্মান পাইবার জন্য, লেখাপড়ার আবশ্যকতা প্রকাশ্যরূপে বলা না হইয়া থাকিলেও, এই জন্য বালক লেখাপড়ায় মনোযোগ করুক, এমনই একটা গ্রন্থকারের ইচ্ছা দেখা যায় না কি ?

এ সম্বন্ধে বাহুল্যরূপে যুক্তি-প্রমাণ দেওয়া এরূপ স্থলে অসম্ভব। গতবারে সমিতি এইরূপ কোন তর্ক উত্থাপনও করেন নাই। যাহা হউক, যদি বাস্তবিকই এইরূপ উপদেশ হিন্দুশাস্ত্রবিরুদ্ধ হয়, সেই জন্য আমার এই গ্রন্থ উপেক্ষিত হউক, তাহাতে আমার আনন্দই হইবে। অন্যথা, অন্য দোষ না থাকিলে, আমার এই গ্রন্থখানি সেই বিশেষত্ব জন্যই কিছু অনুগ্রহ দাবী করিতে পারে কি না, তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

কলিকাতা ; চৈত্র ৪, ১৩০৩। শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায়।

সূচীপত্র।

উপক্রমণিকা।

প্রথম পরিচ্ছেদ—শরীর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—মন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—অপরাপর বিষয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—মহতী কাহিনী।

সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষা সযত্নে গ্রহণ না করিলে হইবেই না। এখন আর.গুরুর নিকট সে শিক্ষা সম্যক্ প্রত্যাশা করিতে পার না—সে শিক্ষা এখন নিজে নিজেই করিতে হইবে। অবশ্য, পিতা মাতা শিক্ষক প্রভৃতি হিতৈষী গুরুজন তোমাদিগকে সে শিক্ষা-লাভে সহায়তা করিতে পারিবেন, কিন্তু সে শিক্ষা প্রধানতঃ আত্মচেষ্টাসাপেক্ষই থাকিবে।

তোমাদিগকে সেইরূপ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার জন্য, এবং তাহাতে তোমাদিগের প্ররোচনা জন্মাইবার জন্য আমি আজ কয়েকটি কথা বলিব।

সর্ব্বপ্রথমে আমি তোমাদিগকে ভক্তিসম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজন তোমাদিগের যে নিতান্ত ভক্তির পাত্র, তাহা সকলেই অবগত আছ। পিতা মাতাকে ভক্তি সকলেই করিয়া থাক; সে সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার, তাহা অন্যত্র বলিব। আমি এখানে শিক্ষকের প্রতি ভক্তির কথাই বলিতেছি। যাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে হয়, তাঁহাকে একান্ত ভক্তি করা আবশ্যক তাঁহার কথায় সমুচিত বিশ্বাস রাখা আবশ্যক। শিক্ষকের শিষ্যের প্রতি এই ভক্তি-বিশ্বাসের অভাব হইলে, উপদেশ কার্য্যকর হইতে পারে না। শিক্ষকগণকে ভক্তি বিশ্বাস না করিলে তাঁহাদিগের যে পরিমাণে অসম্মান হইবার সম্ভাবনা, তদপেক্ষা তোমাদিগেরই অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা। নীতিশিক্ষকগণকে ভক্তি-বিশ্বাস না করিলে নীতিশিক্ষাই হইতে পারে না। একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত দিতেছি। শিক্ষক বলিলেন "বৎসগণ। তোমরা কদাপি পাঠাবস্থা-

কালে নৃত্যগীতে অনুরক্ত হইও না, শৈশবে উহাতে অনুরক্তি জন্মিলে পরিণামে শিক্ষার ব্যাঘাত ও চরিত্রের স্খলন হইবার সম্ভাবনা।” তোমরা তাঁহাকে ভক্তি করিলে না, তাঁহার এই কথা বিশ্বাসও করিলে না, সুতরাং নৃত্যগীতস্পৃহাও পরিত্যাগ করিতে তোমাদের প্রবৃত্তি হইল না। কিন্তু ইহার ফল কি হইল ? না, পরিশেষে হয় ত তজ্জন্য তোমাদিগকে অধঃপাতে যাইতে হইল। সকল কার্য্যের পরিণাম সকলে পরীক্ষা দ্বারা জানিতে গেলে সংসারে বিপদের সীমা থাকে না। অগ্নির দাহশক্তি অনুভব করিতে কি প্রত্যেকেরই অগ্নিমধ্যে হস্ত রাখিতে হইবে? বিষের প্রাণহারিণী শক্তি কি বিষদগ্ধ মনুষ্য না দেখিয়া বিশ্বাস করিবে না ? এরূপ হইলে জগৎ চলিতে পারে না। অন্যের কথায় বিশ্বাস করিয়া তোমাদের অনেক কার্য্যই করিতে হইবে।

প্রশ্ন হইতে পারে, যিনি চরিত্রবান, নীতিপরায়ণ, তাঁহাকে যেন ভক্তিবিশ্বাস করা গেল; কিন্তু যিনি সেরূপ নহেন, তিনি শিক্ষক হইলে শিষ্য তাহাকেও কি ভক্তি করিবে ? ইহার একমাত্র উত্তর আমি এই জানি যে, যিনি শিক্ষক, যাঁহার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে, তাঁহাকে ভক্তি করিতেই হইবে।

ভক্তির একটী অসাধারণ গুণ আছে। ইহাতে ভক্তকে সেবকপদে রাখিয়া, তাঁহাকে নম্রতা, বিনয়, আত্মোৎসর্গ প্রভৃতি কয়েকটি সুন্দর অলঙ্কারে বিভূষিত করে। ভক্তের হৃদয় কি সুন্দর! নিরাকার ঈশ্বরভক্তই হউন, কি সাকার দেবভক্তই হউন, কি প্রত্যক্ষ মনুষ্যবিশেষের ভক্তই হউন, ভক্তের ভক্তি-বিস্ফারিত অন্তরে কি অপূর্ব্ব আনন্দের লহরীই ক্রীড়া করিয়া

থাকে ! ভক্তিতে যে সুখ উৎপাদন করে, অর্থে তাহা পারে না। এমন সুখের জিনিস সকলেরই আহরণ করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অতএব একপ্রকার বলা যায় যে, তোমরা পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া যেখানেই এই বৃত্তির বিকাশ করিতে পার, করিবে। অযোগ্য পাত্রে ভক্তি করিলেও ভক্তির ফল যে আনন্দ তাহা লাভ করিতে পারিবে।

কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষককেই ভক্তি করিতে হইবে এমন নহে। যাঁহার নিকটে কিছু মাত্র শিক্ষা পাইতে চাহ— যাঁহার নিকটে সামান্য শিক্ষাও প্রাপ্ত হইয়াছ, তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষক না হইলেও তাঁহাকে ভক্তি করিবে। যদি কোন গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া কোন ফল পাইতে চাহ, গ্রন্থকারকেও ভক্তি করিবে। কারণ গ্রন্থকারও এক শ্রেণীর লোক-শিক্ষক।

যিনি নীতিপরায়ণ, তিনি যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউন না কেন, তাঁহাকে ভক্তি করিবে; যিনি জ্ঞানী তাঁহাকে ভক্তি করিবে; এই প্রকার যাঁহাকে কোন বিশেষ গুণে অলঙ্কৃত দেখিবে, তাঁহাকেই ভক্তি করিবে। এই প্রকার ভক্তি, নীতি, জ্ঞান ও গুণের প্রতি ভক্তি, ব্যক্তিবিশেষের প্রতি ভক্তি নহে।

কিরূপে ভক্তিবৃত্তির বিকাশ করিতে হয়, তাহার সহজ উপায় বলিয়া দিতেছি। যাঁহারই সহিত আলাপ হইবে, তাঁহারই গুণভাগ অনুসন্ধান করিতে থাকিবে। তিনি বালকই হউন, আর বৃদ্ধই হউন, স্ত্রীলোকই হউন, আর পুরুষই হউন, তাঁহার যে সকল গুণ তোমাতে নাই বা থাকিলেও তাঁহাতে যে পরিমাণে আছে, তোমাতে সে পরিমাণে নাই, তাহাই অতি সূক্ষ্মভাবে

অনুসন্ধান করিতে থাকিবে। অনুসন্ধান করিয়া অহরহঃ পর্য্যালোচনা করিতে থাকিবে—দেখিবে, অতি অল্পদিন মধ্যেই তুমি তাঁহার অকৃত্রিম ভক্ত হইয়া পড়িয়াছ। যদি সেইভাবে তুমি ভক্তির বিকাশচেষ্টা করিতে পার, তবে বুঝিতে পারিবে ভক্তির কি ক্ষমতা—ভক্তির কি ফল! বুঝিতে পারিবে, ব্যক্তি মাত্রকেই কেন আমি ভক্তি করা সম্ভব ও কর্ত্তব্য মনে করি।

ভক্তি সম্বন্ধে অদ্য এই পর্য্যন্তই বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম। ভক্তির চরম বিকাশ ঈশ্বর-ভক্তিতে। তাহা তোমাদিগকে এখন না বলিলেও চলিতে পারে; পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ভক্তি-বৃত্তির অনুশীলন কর, সে জ্ঞান আপনা হইতেই আসিবে।

দেখ বৎসগণ! এই সংসারে কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেই সুখলাভের প্রত্যাশায় কার্য্য করিয়া থাকে। যাঁহারা সন্ন্যাসী, বা সুখ দুঃখে অনাসক্ত মহাপুরুষ তাঁহাদিগের কথা স্বতন্ত্র. আমি সাধারণ গৃহস্থদিগের কথাই বলিতেছি। সুখ সকলেই চাহে, সুখ কিন্তু জল বায়ুর ন্যায় এমন পদার্থ নহে যে, তাহা বিনা যত্নে যেখানে সেখানে পাইতে পারা যায়। এ সুখের জন্য মানুষের চেষ্টা করিতে হয়। চেষ্টা করিলেই যে সর্ব্বদা সুখলাভ করা যায়, এমনও দেখা যায় না; আবার বিনা চেষ্টাতেও লোক সুখী হইতেছে, এমনও দেখা যাইতেছে। তথাপি এ কথা বলা যাইতে পারে যে, সুখেরজন্য সকলেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এই চেষ্টা কিরূপে করিতে হইবে, তাহাই আমার বক্তব্য।

একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, উৎকৃষ্ট সুখলাভার্থ আমাদিগের শরীর, মন ও অপরাপর কতক-

গুলি বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। শরীর ভাল না থাকিলে, কোন প্রকার সুখজনক কার্য্যই সুখকর বলিয়া বোধ হয় না। যাঁহার শরীর রুগ্ন রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্য, সাধুজনের ন্যায় নির্ম্মল অন্তঃকরণ থাকিলেও, তাঁহার তাহাতে সুখ বোধ হয় না। আবার যাহার মন ভাল নহে, যিনি পরশ্রীকাতর, যিনি ক্রোধী, তাঁহার শরীর সুস্থ ও পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ় হইলেও, তিনি সুখলাভে সমর্থ হন না। শরীর ও মনের এইরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ রহিয়াছে যে, একের অসুখে অন্যেরও অল্লাধিক অসুখ হইয়া থাকে।

তার পরে কেবল এই শরীর ও মন ভাল থাকিলেও যে সংসারে সুখী হওয়া যায়, এমন নহে। সংসারে সুখলাভার্থ আরও অনেক বিষয় আবশ্যক। এই জন্য উপযুক্ত অর্থ আবশ্যক, উৎকৃষ্ট পরিজন আবশ্যক, উৎকৃষ্ট প্রতিবেশী আবশ্যক, উৎকৃষ্ট স্বদেশী আবশ্যক। ফলতঃ যাঁহাদিগেরই সহিত এই সংসারে সম্বন্ধ বা সংস্রব হইতে পারে, তাহাদিগের সকলেই তোমাদিগের সুখলাভের অনুকুল না থাকিলে, সর্ব্বাঙ্গীণ সুখপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই।

উপযুক্ত অর্থ না থাকিলে, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যও কষ্ট হইতে পারে। সংসারীর পক্ষে এ কষ্ট সাতিশয় দুঃসহ সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই—এ কথা সংসারী মাত্রই জ্ঞাত আছেন এমন কি, তোমরা বালক হইলেও, এ কথা না জান এমন নহে।

আবার দেখ, উত্তম শরীর ও মন এবং উপযুক্ত অর্থ হইলেও

যে সুখী হইতে পারা যায়, এমন নহে। যাঁহার পরিজন ভাল নহে, তাঁহার গৃহ অরণ্যস্বরূপ। তিনি প্রভূত ধন, সুস্থ শরীর, এবং নির্ম্মল চরিত্রের অধিকারী হইলেও, সুখলাভে সমর্থ হন না। অহর্নিশ যাঁহাদিগকে লইয়া সংসারব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে হয়, যাঁহাদিগের সুখদুঃখে সুখদুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাঁহারা উত্তম না হইলে, নিশ্চয়ই সুখলাভে বিঘ্ন জন্মিবে।

যাঁহার রাজ্যে বাস করিতে হয়, যাঁহার নিয়ম ও আজ্ঞা পালন করিয়া সংসার পথে বিচরণ করিতে হয়, তিনি যদি উৎকৃষ্ট না হন, তাহা হইলেও, সুখলাভে বিঘ্ন জন্মিতে পারে। কত আর দেখাইব—ইহাই জানিয়া রাখিও, যাঁহাদিগের সহিত কোন না কোন প্রকারে তোমাদিগের সম্বন্ধ রহিয়াছে, সম্বন্ধ উপস্থিত হইতে পারে, তাঁহারা ভাল বা মন্দ হইলে তোমাদিগের অল্লাধিক সুখ বা দুঃখ হওয়া একান্ত সম্ভবপর।

আমি অদ্য হইতে প্রতিদিন তোমাদিগকে ইহার এক একটি বিষয় সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিতে চাহি। আমার কথাগুলি জটিল মনে করিয়া, তাহা বুঝিতে ঔদাস্য করিও না। আমি যাহা বলিব, তোমরা যাহাতে বুঝিতে পার, এমন করিয়াই বলিব। আমার একান্তই বিশ্বাস আছে, চেষ্টা করিলে, ইহা তোমরা সকলেই বুঝিতে পারিবে। এখন ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করি, আমার কোন প্রকার উপদেশে যেন তোমাদের কোন প্রকার ক্ষতি সংঘটন না হয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ—শরীর

স্বাস্থ্য ও বল।

যে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যথাসম্ভব পূর্ণ ও কর্ম্মঠ, যে শরীর কষ্টসহিষ্ণু ও শ্রমক্ষম, তাহাকেই উৎকৃষ্ট শরীর বলা যাইতে পারে।

শরীরকে উৎকৃষ্ট করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে তাহার স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য যত্ন করিতে হইবে। আহার, পান, বিশ্রাম ও ব্যায়ামের সুনিয়ম রক্ষা করিতে পারিলেই, শরীর প্রায় সুস্থ ও বলবান্ হইয়া থাকে।

আহার।

শরীররক্ষার্থ সকল প্রাণীরই আহার আবশ্যক। এই আবশ্যকতানিবন্ধন মঙ্গলময় পরমেশ্বরের ইচ্ছায় আহারে প্রাণীর প্রসক্তিও প্রবল। খাদ্যদ্রব্য সুজীর্ণ হইলে তাহাতে যেমন শরীরের ক্ষয় পূর্ণ ও বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে, রসনার তৃপ্তিকর হইলে, তাহাতে তেমনই এক অনির্ব্বচনীয় সুখও জন্মিয়া থাকে। যদি সকল প্রকারের আহার্য্য দ্রব্য সর্ব্বসময়ে সমপরিমাণে যুগপৎ সুখোৎপাদন ও শরীরের পুষ্টিবর্দ্ধন করিতে পারিত, তবে এ সম্বন্ধে বেশী কথা বলিবার আবশ্যকতা থাকিত না। কিন্তু স্বভাবের নিয়ম অন্যরূপ। যাহা বেশী পুষ্টিবর্দ্ধক, হয়ত তাহা কম তৃপ্তিকর—যাহা বেশী তৃপ্তিকর, হয়ত তাহা কম পুষ্টিবর্দ্ধক। এই কারণে আহারেও বিচারশক্তি প্রয়োগ করিতে হয়।

নাই। প্রত্যুত কেবল স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই শরীরের বল বাড়িবে না, বলবৃদ্ধির জন্য অন্য চেষ্টাও চাই।

ব্যায়ামচর্চ্চায় শরীরের বল বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যাঁহার শরীর সুস্থ, তিনি যদি রীতিমত ব্যায়ামচর্চ্চা করেন, তবে শীঘ্রই বলশালী হইতে পারেন। কিন্তু তোমরা এরূপ মনে করিও না যে, ইংরাজী প্রথানুযায়ী সমান্তরাল প্রভৃতি দণ্ডে শরীর সঞ্চালন না করিতে পারিলে, প্রকৃত ব্যায়ামচর্চ্চা হয় না। যাহাতে হস্ত, পদ, স্কন্ধ, মস্তক, বাহু, বক্ষ প্রভৃতি সুদৃঢ় হয়, যাহাতে মাংস-পেশী সকল সবল ও কর্ম্মক্ষম হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যে কোন প্রকার ক্রীড়া বা কুস্তি করিবে, তাহাতেই ব্যায়াম-চর্চ্চার ফল হইবে। নৌকাসঞ্চালন, অশ্বারোহণ, দ্রুতভ্রমণ, নদ্যাদিতে সন্তরণ এই সকল কার্য্য ও উত্তম ব্যায়াম। এতদ্দেশে পূর্ব্বে "হা ডুগ" প্রভৃতি অনেক প্রকার বাল্যক্রীড়া প্রচলিত ছিল—এখন তাহা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে; ঐ সকল ক্রীড়াও শরীরের বিশেষ উপকারী। বৈদেশিক ক্রীড়া হইতে এই সকল ক্রীড়া কোন অংশে ন্যূন নহে।

শারীরিক বল আবশ্যক বটে, কিন্তু শারীরিক বল সঞ্চয়ের জন্য অন্যান্য বিষয়ের প্রতি অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে। বিদ্যা-বুদ্ধি না থাকিলে, ধনজন না থাকিলে, কেবল শারীরিক বলে সংসার-যাত্রা সুখে নির্ব্বাহ করা যায় না।

তোমাদিগের অনেকেই ব্যায়ামে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছ। ইহাতে শরীরের বলবৃদ্ধি হইবে বলিয়া বিশেষ আহ্লাদিত আছি, কিন্তু সাবধান এই জন্য যেন বিদ্যাশিক্ষায় ত্রুটি না হয়।

কষ্টসহিষ্ণুতা।

শরীর কষ্টসহিষ্ণু না হইলে, উত্তম স্বাস্থ্য ও প্রভূত বল থাকিলেও সে শরীরকে অকর্ম্মণ্য বলিতে হয়।

সংসারে থাকিলে, আমাদিগের অনেক প্রকার কষ্টই পাইতে হয়। নিয়মমত সকল দিন সকলের আহারনিদ্রা ঘটিয়া উঠে না। এরূপ স্থলে যিনি কষ্টসহিষ্ণু নহেন, তাঁহার বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হয়। পরিবারমধ্যে রোগশোক উপস্থিত হইলে আহারনিদ্রার নিয়ম প্রায় সকলেরই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। রোগীর শুশ্রূষা যিনি করিবেন, তাঁহার ত কথাই নাই। যিনি পূর্ব্ব হইতেই শারীরিক কষ্ট সহ্য করিতে অভ্যাস করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার এ সকল বিষয়ে বিশেষ অসুবিধা হয় না। কিন্তু যাঁহারা তাহাতে অনভ্যস্ত, যাঁহারা কষ্টে অসহিষ্ণু, তাঁহাদিগের হয় ত সুচারুরূপে কর্ত্তব্য পালন হয় না, নতুবা কর্ত্তব্য পালন করিতে গিয়া, শরীর রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। যেমন দেখ, মাতা পিতা ভ্রাতা ভগিনীর উৎকট পীড়া হইলে, তাঁহাদের শুশ্রূষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু যিনি কষ্টসহিষ্ণু নহেন, তিনি হয় ত রাত্রি জাগরণে নিতান্ত কষ্ট বোধ করিয়া কর্ত্তব্যপালনে অশক্ত হন, অথবা যদি কষ্টে কর্ত্তব্য পালন করিতে চেষ্টা করেন, হয় ত জ্বরাদি রোগে তাঁহাকে আক্রান্ত হইতে হয়। আহার নিদ্রার নিয়মিত সময় থাকা ভাল, কিন্তু তাই বলিয়া দু এক দিন সে নিয়মের লঙ্ঘন হইলেই, তজ্জন্য বিশেষ কষ্ট বোধ করা উচিত নহে।

ধীরে ধীরে অভ্যাস দ্বারা সকলই সহিতে পারা যায়। যে

বিষপানে মানবের মৃত্যু ঘটে, বিন্দু বিন্দু করিয়া সেই বিষ পান করিতে অভ্যাস করিয়া, অনেকে তাহা অতি রিক্ত পান করিলেও মৃত্যুমুখে পতিত হন না, এরূপ দেখা গিয়াছে। প্রাচীন কালের লোকেরা বাল্যাবধি উপবাসাদিতে অভ্যস্ত হইয়া ক্রমশঃ দুই তিন দিবসও কিরূপ বিনাকষ্টে উপবাসী থাকেন তাহা তোমরা দেখিয়াছ। তোমরাও চেষ্টা করিলে, আহারনিদ্রাজনিত কষ্ট কতক পরিমাণে জয় করিতে পার। "পরিব না—অত্যন্ত কষ্ট হইবে—মরিয়া যাইব" ইত্যাদি অমূলক চিন্তাতেই লোককে অসহিষ্ণু ও অকর্ম্মণ্য করিয়া থাকে। 'নিশ্চয়ই করিতে হইবে", এরূপ ধারণা লইয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাতে সে প্রকার কষ্ট বোধ হয় না। তোমাদিগের একদিন উপবাস করিতে যেরূপ কষ্ট হইবে, অল্পবয়স্কা হিন্দুবিধবাগণের "একাদশী" করিতেও তত কষ্ট হইবে না। কারণ তাহারা জানিতেছে যে ঐ উপবাস তাহাদিগের করিতেই হইবে। কেবল মাত্র এই নিশ্চিত ধারণার জন্য লোকের অনেক সময়ে কষ্ট অনেক কম হয়।

সংসারের যে পথেই বিচরণ কর না, তোমাদিগকে কোন না কোন প্রকার কার্য্য অনুষ্ঠান করিতেই হইবে। যিনি রাজাধিরাজ তাঁহাকেও রাজ্যশাসন করিতে হয়। এই সকল কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে তোমাকে কষ্টসহিষ্ণু হইতে হইবে। জগতের ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া দেখ, কষ্ট স্বীকার না করিয়া, কষ্টসহিষ্ণু না হইয়া কেহই প্রায় ধন ও যশ সঞ্চয় করিতে সমর্থ হন না।

শারীরিক পীড়া হইলেও, বিবিধ প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে

হয়। অনেক পীড়াতেই চিকিৎসকগণ অন্নাদির আহার রহিত করিয়া দেন। এরূপ স্থলে যিনি একবারে কষ্ট সহ্য করিতে না পারেন, তাঁহার কষ্টের পরিসীমা থাকে না। কুপথ্য গ্রহণ করিয়া হয়ত তাঁহাকে এক দিবসের স্থলে দশ দিবস দুঃখ ভোগ করিতে হয়। দুই এক জনের অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়াও অসম্ভব নহে।

শরীরে ব্রণাদি হইলে, দুই এক স্থলে তাহাতে অস্ত্রাঘাত আবশ্যক হয়। এমন অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা এই কষ্টের ভয়ে, সেই ব্রণাদির রীতিমত চিকিৎসা করাইতে না পারিয়া অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকেন।

সকল প্রকার কষ্টই অভ্যাসবলে সহ্য করিতে পারা যায়। তোমরা এমন অনেক বালক দেখিয়াছ, যাহাদিগকে অত্যন্ত প্রহার করিলেও, তাহারা কষ্ট বোধ করে না। অনবরত প্রহার সহ্য করায় তাহাদের এইরূপ অভ্যাস হইয়া যায়। এই অভ্যাস অনিচ্ছাবশতঃই জন্মিয়া থাকে। যদি ইচ্ছা করিয়া কেহ কোন বিষয় অভ্যাস করিতে যায়, ইহার অর্দ্ধেক পরিমাণও কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। আমি শুনিয়াছি, কোন এক সুখপ্রতিপালিত ব্যক্তির কারাবাস সম্ভাবনা হইলে, কারাবাসে যেরূপ থাকিতে হয়, পূর্ব্ব হইতে তিনি সেইরূপ থাকিতে অভ্যাস করিতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে তাঁহার কারাবাস ভোগ করিতে হইল না; কিন্তু যদি ভোগ করিতেও হইত, তথাপি বোধ হয় অন্যান্য কারাবাসী হইতে তাঁহার কষ্ট অনেক পরিমাণে কম হইত।

কখন কাহার কোন প্রকার বিপদে পতিত হইতে হয়, কেহই বলিতে পারে না। কখন কাহার কোন প্রকার শারীরিক কষ্ট পাইতে হয়, তাহার স্থিরতা নাই। এরূপ স্থলে সকলেরই শরীরকে এরূপ কষ্টসহিষ্ণু করিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, কোন প্রকার কষ্টমধ্যে পড়িলেও সহসা তাহার কোন পীড়া উৎপন্ন না হইতে পারে। সাংসারিক সুখলাভের জন্য শারীরিক কষ্ট-সহিষ্ণুতা একান্ত আবশ্যক।

শ্রমপারগতা।

শরীরের যেমন স্বাস্থ্য, বল ও কষ্টসহিষ্ণুতা থাকা আবশ্যক —তেমন আবার শ্রমপারগতা থাকাও আবশ্যক। সচরাচর শারীরিক কষ্টসহিষ্ণুতা গুণ থাকিলেই, শ্রমপারগতা গুণও বর্ত্ত-মান থাকে—কিন্তু দুই এক স্থলে তাহার ব্যত্যয়ও ঘটিয়া থাকে; এই জন্য ইহারও উল্লেখ আবশ্যক মনে করিলাম।

পরিশ্রমে আপাততঃ কিছু কষ্ট বোধ হয়। এই জন্য সুখার্থিগণ সচরাচর পরিশ্রমে বড়ই বিমুখ হইয়া পড়েন। কিন্তু ঈশ্বরের এইরূপই নিয়ম যে, উৎকৃষ্ট সুখলাভ করিতে হইলে প্রায় প্রথমে কিছু কষ্ট স্বীকার করিতেই হইবে।

এই পরিশ্রম দ্বিবিধ—শারীরিক ও মানসিক। যে পরিশ্রমে শারীরিক ক্রিয়া—অঙ্গসঞ্চালনাদি অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে তাহাকে শারীরিক পরিশ্রম বলা হইয়া থাকে। আমি এখন শরীরের কথাই তোমাদিগকে বলিতেছি—সুতরাং আমার এই প্রবন্ধ শারীরিক পরিশ্রম সম্বন্ধে, মানসিক পরিশ্রম সম্বন্ধে নহে।

কৃষকাদির যে প্রকার শারীরিক পরিশ্রমের আবশ্যকতা, ভদ্রশ্রেণীর লোকের সচরাচর সেরূপ আবশ্যকতা নাই। তাঁহাদের মানসিক পরিশ্রমই অধিক আবশ্যক; তাহা হউক, তথাপি তাঁহাদের শারীরিক পরিশ্রমেও পটু হওয়া কর্ত্তব্য। কারণ সচরাচর না হউক, সময়বিশেষে সংসারিমাত্রেরই শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয়। দুই একটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। মনে কর, কোন বিশেষ কার্য্যবশতঃ কোন ব্যক্তির আজ অনেক দূরে যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক। গন্তব্য স্থানে যাইতে উপযুক্ত যান পাওয়া যায় না—অথবা পাওয়া গেলেও তাহাতে এত ব্যয় হয় যে, তাহার অবস্থায় তাহা চলিতে পারে না এরূপ স্থলে যদি সেই ব্যক্তি গন্তব্য স্থানে পদব্রজে গমন না করিতে পারেন, তবে তাঁহার অসুবিধার সীমা থাকে না। বাড়ীতে কোন ক্রিয়াকাণ্ড উপস্থিত হইলেও, প্রায় সকল শ্রেণীর ব্যক্তিরই অল্পাধিক শারীরিক পরিশ্রমের আবশ্যকতা উপলব্ধি হয়। এই জন্য, সচরাচর আবশ্যক না হইলেও, শরীরকে পরিশ্রমপটু করিতে অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে যে ব্যায়ামের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতেই শরীর পরিশ্রমপটু হয়। কিন্তু ইহার মধ্যে যাহাতে দূরস্থান পদব্রজে গমনের ক্ষমতা জন্মে, তাহার প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য রাখা তোমাদিগের আবশ্যক।

অন্যান্য গুণের ন্যায় এই গুণও অভ্যাস দ্বারা জন্মিতে পারে। ক্ষীণকায়, দুর্ব্বল ব্যক্তিগণকেও সুদূরস্থানে অনায়াসে অতি অল্প সময়ের মধ্যে চলিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। কেবলমাত্র অভ্যা-

সেই এই গুণ লাভ করিবার একমাত্র উপায়। অতএব তোমরা অভ্যাস দ্বারা যাহাতে শরীরকে পরিশ্রমপটু, পদব্রজে দূরস্থানে গমনাদিতে সমর্থ করিতে পার, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—মন

বোধ হয়, ঈশ্বরভক্তির ন্যায় মনের সুখজনক এমন বৃত্তি আর নাই। ইহা যে সময়েই হউক, যেরূপেই হউক, হৃদয়মধ্যে সঞ্চারিত হইলে, কি যে অপূর্ব্ব আনন্দে আপ্লুত হইতে হয়, তাহা বর্ণনা করা যায় না। যখন হৃদয়ে এই ভক্তির উচ্ছ্বাস প্রবল হয়, তখন কোন প্রকার যন্ত্রণাই দুঃখজনক বলিয়া অনুভূত হয় না—কোন প্রকার কষ্টই কষ্ট বলিয়া বিবেচনা হয় না। কি দুঃসহ দারিদ্র্যযন্ত্রণা, কি অসহ্য অপত্যবিরহ, কি মর্ম্মান্তিক মৃত্যুযাতনা, হৃদয়ে যখন প্রকৃত ভক্তির আবির্ভাব হয়, তখন ইহার কিছুতেই চিত্ত বিচলিত হয় না। অহো! ঈশ্বরভক্তি কি অপূর্ব্ব আনন্দময়ী! পৃথিবীতে যত প্রকার সুখ আছে, তাহার সমগ্র একত্র করিলেও এই আনন্দের এক কণিকার তুল্য হইতে পারে না। এই আনন্দে সকলেই অধিকারী। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি বৌদ্ধ, কি খৃষ্টান কি যুবক, কি বৃদ্ধ, কি রাজা, কি প্রজা, কি ধনী, কি নির্ধন সকলেই ইচ্ছা করিলে এ আনন্দ উপভোগে সমর্থ হন।

এই ভক্তি কিরূপে বিকাশিত করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে স্থূল-ভাবে কয়েকটি কথা তোমাদিগকে বলিতেছি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, যাঁহাকে ভক্তি করিতে হইবে, অনুক্ষণ তাঁহার গুণাবলী স্মরণ ও আলোচনা করিলেই, তাঁহার প্রতি ভক্তি বিকাশিত হয়। ঈশ্বরের অনন্ত গুণরাশি অহরহঃ পর্য্যালোচনা করিলে, তাঁহার প্রতি ভক্তির বিকাশ না হইয়াই থাকিতে পারে না। তাঁহার অনন্ত গুণের কথা মানবের ক্ষুদ্র বুদ্ধির বিষয়ীভূত নহে সত্য, তবে তাঁহার যে অপার করুণা-প্রস্রবণ নিরন্তর আমাদিগকে সুখসুধায় সিক্ত করিতেছে, তাঁহার দুই একটি কথা ভাবিয়া দেখিলেও, তাঁহার প্রতি ভক্তির স্রোত হৃদয়কন্দরে সবেগে প্রবাহিত হইবে। কখন্ না তাঁহার এই করুণারাশির পরিচয় পাওয়া যায়? আহারে, নিদ্রায়—ভ্রমণে, শয়নে—প্রাতে, মধ্যাহ্নে,—সায়াহ্নে, নিশীথে—কখন না তাঁহার সেই অতুলনীয় দয়ারাশি আমাদিগকে ভোগ করিতে হয়? এই পৃথিবীতে যত প্রকার সুখ সম্ভোগ করিতে পারিতেছি, সকলই তাহার কৃপা-বশতঃ জানিবে। ঐ যে রজনীপ্রভাতে সুশীতল সমীরণ মন্দ মন্দ বহিয়া আমাদিগের শরীর শীতল করিতেছে, সুগন্ধি প্রসূন গন্ধবিতরণে আমাদিগের নাসিকা পরিতৃপ্ত করিতেছে, উহারা কাঁহার আজ্ঞায় এইরূপ করিতেছে? তাঁহারই আজ্ঞায়। ঐ যে নীরা কল্লোলিনী, মাতৃদুগ্ধের ন্যায় সলিলরাশি বক্ষে করিয়া আমাদিগের তৃষ্ণার সময়ে সলিল যোগাইতেছে, উহা কাঁহার আজ্ঞায় এইরূপ করিতেছে?—তাঁহার আজ্ঞায়। এই যে শস্য-পূর্ণা বসুন্ধরা আমাদিগকে নানা প্রকার আহার যোগাইতেছে,

ইহা কাঁহার আজ্ঞায় হইতেছে? তাঁহার আজ্ঞায়। অপার তাঁহার করুণা—অসীম তাঁহার গুণ। তাঁহার দয়ার কথা ভাবিয়া দেখ, গুণের কথা চিন্তা করিয়া দেখ, হৃদয় স্বতঃই ভক্তিভরে প্রণত হইয়া পড়িবে।

ক্রোধ।

যেমন ভক্তি আমাদিগের অন্তরে বিকশিত হইলে আমরা পরম আনন্দ অনুভব করিয়া থাকি, তেমন ক্রোধ আমাদিগের হৃদয়ে সঞ্জাত হইলে আমরা ভয়ানক অশান্তি অনুভব করিতে থাকি। ক্রোধ বড় দুর্জ্জয় রিপু। এই রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া লোকে যে কত প্রকার কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে—তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই দুর্দ্দমনীয় রিপু বড়ই অশান্তিদায়ক। যদি এই বৃত্তি চরিতার্থ করিতে না পারা যায়—যদি যাহার উপর ক্রোধ জন্মিল, তাহাকে কোন প্রকার শাস্তি প্রদান না করা যায় তবে অগ্নিকণিকার ন্যায় এই বৃত্তি হৃদয়কন্দরে থাকিয়া থাকিয়া সুখশান্তিকে ভস্মসাৎ করিতে থাকে। আর এই বৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারিলেই কি প্রকৃত সুখ জন্মে? প্রায়ই তাহা নহে। যখন ক্রোধ হয়, তখন যাহার উপর ক্রোধ হইল, তাহাকে দমন করিতে পারিলে, অতি অল্পকালের জন্য কিছু সুখবোধ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে প্রায়ই সেই সুখ আমাদিগকে দ্বিগুণতর কষ্ট প্রদান করিয়া থাকে। অদ্য বড় ক্রোধ হইল—ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া একজনকে কটূক্তি করিলাম, কল্য সে ক্রোধের

নিবৃত্তি হইবামাত্র অনুতাপে ও লজ্জায়, যেমন মরমে মরিয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু এই যে কটূক্তির কথা বলিলাম, ইহা ক্রোধের সহজ কার্য্যমাত্র। ক্রোধ পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হইলে, লোকে নরহত্যাদি করিতেও কুণ্ঠিত হয় না; এমন কি, এই ক্রোধের বশে দুই এক জনকে এমনই ভ্রষ্টবুদ্ধি হইতে দেখা যায় যে, তাহারা মাতা পিতা প্রভৃতি গুরুজনকেও কটূক্তি করিয়া থাকে। ইঁহার অধিকও দেখিতেও পাওয়া যায়—আমি সে সকল পাশব ক্রিয়ার কথা তোমাদিগের নিকটে উল্লেখ করিতে চাহি না।

তবেই দেখ, ক্রোধের ফল প্রায় সর্ব্বত্রই অশান্তি ও কষ্ট। যদি এই বৃত্তি চরিতার্থ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলেও কষ্ট—যদি ইহা চরিতার্থ করিতে পারা যায়, তাহা হইলেও প্রায় কষ্ট পাইতে হয়। তোমরা যত্নপূর্ব্বক ইহাকে দমন করিতে চেষ্টা করিবে।

হৃদয়ে ক্রোধ জন্মিলে, ননা প্রকারে আমাদিগকে বিচলিত করিয়া থাকে। তখন রসনা ঘোর অসংযত হইয়া পড়ে—নানা প্রকার অবাচ্য ও কটু কথা রসনা হইতে বহির্গত হইতে থাকে। বুদ্ধিবৃত্তির স্থিরতা থাকে না। হস্তপদও যেন বিবাদের জন্য অগ্রসর হইতে থাকে। এই রূপ সময়ে বিশেষ সতর্কতা গ্রহণ না করিলে পরিণামে বড়ই কষ্ট পাইতে হয়। ক্রোধ যাহাতে অনর্থক হৃদয়ে বিকাশ না পাইতে পারে, তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে চেষ্টা করা আবশ্যক। কিন্তু এ চেষ্টায় বিশেষ কৃতকার্য্য হইলেও ক্রোধের হস্ত হইতে সম্যক্ প্রকারে মুক্তিলাভ অসম্ভব।

আমি তোমাদিগকে এ সম্বন্ধে কয়েকটি পরামর্শ দিতে পারি—বোধ হয়, সেই পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিলে ক্রোধের কুফল অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইতে পারে।

যখন ক্রোধসঞ্চারের সম্ভাবনা বুঝিতে পারিবে, তখনই সেই ক্রোধবিকাশের স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। যেমন পথিপার্শ্বে সর্প দেখিলে পথিক ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই পথ পরিত্যাগ করে, তোমরাও তেমনই যেখানে ক্রোধসঞ্চারের সম্ভাবনা দেখিবে, সেই স্থান অবিলম্বে পরিত্যাগ করিবে। যদি এইরূপ করিতে পার, ক্রোধ তোমাদিগের কোন প্রকার অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না। যদি একান্তই ইহা না পার, তখন সঙ্কল্প-পূর্ব্বক রসনা সংযত রাখিতে চেষ্টা করিবে। রসনা সংযত রাখিতে পারিলে, মৌনী হইয়া থাকিতে পারিলেও এই ক্রোধ-রিপু বিশেষ কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না। কিন্তু একবার রসনা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িলেই, ক্রমে বুদ্ধিপ্রভৃতিও উচ্ছৃঙ্খল হইতে থাকিবে।

এই পৃথিবীতে যিনি উৎকৃষ্ট সুখ সম্ভোগ করিতে চাহেন, অতি যত্নে তাঁহাকে এই প্রবল বৃত্তি সংযত করিতে হইবে। যাঁহার ক্রোধ সংযত নহে—তিনি অন্যান্য সহস্র প্রকার সুখোপ-করণের অধিকারী হইলেও ইহার বিষে সর্ব্বদা জর্জ্জরিত থাকেন। ইহাতে যেমন অগণ্য শত্রু জন্মাইয়া থাকে—তেমন অগণ্য পাপ-কার্য্যেও রত করায়। ফলতঃ ক্রোধের অসঙ্গত বিকাশ নানা প্রকারেই মানবের অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে।

পরশ্রীকাতরতা।

'পরশ্রীকাতরতা' শব্দে মাৎসর্য্য ও দ্বেষ বুঝায়। যেমন ক্রোধ তেমনই পরশ্রীকাতরতা। হৃদয়ে অশান্তি জন্মাইতে দুইই প্রায় তুল্য। বরং ক্রোধের কারণ অল্প ঘটিতে পারে, পরশ্রীকাতরতার কারণের অভাব নাই। অন্য এক ব্যক্তি আমার কোন অনিষ্ট না করিলে, আমার কোন প্রকার বিরক্তিজনক কার্য্য না করিলে, তাহার প্রতি আমার ক্রোধ জন্মিতে পারে না—কিন্তু কেহ আমার সম্বন্ধে কিছু না করিলেও, পরশ্রীকাতরতার উন্মেষ হইতে পারে। অপরের সুখ, অপরের ঐশ্বর্য্য, অপরের মান, অপরের যশ, দেখিতে পাইলেই পরশ্রীকাতর জন যার পর নাই ক্ষুব্ধ হইতে থাকেন। হয় ত তাঁহারও যথেষ্ট সুখ আছে, যথেষ্ট ঐশ্বর্য্য আছে—যথেষ্ট যশ আছে, যথেষ্ট সম্মান আছে, তবু তিনি অন্যকে এই সকল বিষয়ে অধিকারী দেখিলে মর্ম্মপীড়ায় জ্বলিতে থাকেন। আহা! সে কষ্ট কি মর্ম্মান্তিক। নিজের অভাব জন্য কষ্ট দূর করিতে নানা প্রকার সদুপায় অবলম্বন করা যায়। কিন্তু এই পরশ্রীজন্য কষ্ট দূর করিতে, অসদুপায় অবলম্বন করিয়া পরশ্রী নষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে হয়। তাহাতেই কি কষ্ট দূর হয়? পাপে পাপ বৃদ্ধি করিতে থাকে। পরশ্রীকাতরতা-পাপ পরের হিংসাজনক কার্য্যে প্ররোচনা জন্মায়; ক্রোধও আসিয়া তাহাতে যোগ দেয়। কথাটা আর একটু পরিষ্কার বলিতেছি।

মনে কর, গ্রামের মধ্যে রাখাল বড় দরিদ্র লোক। তাহার অন্নসংস্থান হয় ত, বস্ত্রের সংস্থান হয় না। বস্ত্রের সংস্থান

হয় ত, অন্নের সংস্থান হয় না। এ কষ্ট অবশ্য সামান্য কষ্ট নহে, তবু সে চেষ্টা করিয়া শারীরিক পরিশ্রম করিয়া নানা প্রকার উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিয়া এ কষ্ট দূর করিতে পারে। কিন্তু গ্রামের মধ্যে যে শিরোমণি মহাশয় আছেন, তিনি অত্যন্ত পরশ্রীকাতর, তাঁহার কষ্ট দূর করিবার উপায় ত কিছু দেখা যায় না অন্যে চেষ্টা করিয়া অর্থশালী হইবে, বড় হইবে, তাহার তিনি কি করিবেন? তিনি চেষ্টা করিয়া কয় জনের উন্নতি স্থগিত রাখিতে পারেন? দেশে বিদেশে, যেস্থানে তিনি বড় লোক দেখিবেন, সেইখানেই তাঁহার ঈর্ষানল জ্বলিতে থাকিবে। মনের চিকিৎসা ভিন্ন কিছুতেই তাঁহার এ কষ্ট বিদূরিত হইতে পারে না। গ্রামের মধ্যে এই দরিদ্র রাখালও যদি কায়ক্লেশে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে, তাহাতেও তাঁহার কষ্ট হইবে; এমন কি, এই জন্য দুই এক দিন তাঁহাকে রাখালের প্রতি ক্রুদ্ধ হইতেও দেখা গিয়াছে। বল দেখি তাঁহার এই মনের কষ্ট কিসে দূর হইতে পারে?

এই জন্য তোমাদিগকে বড় সাবধানে এই বৃত্তিটিকে চিনিয়া সংযত রাখিতে বলিতেছি। একটু মনোযোগ করিলেই হৃদয়মধ্যে ইহার সঞ্চার বুঝিতে পারিবে; তখন সাবধানে ইহাকে দমন করিতে চেষ্টা করিবে। এই বৃত্তি যে অশেষ দুঃখের আকর, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে পারিলে, বোধ হয় এই বৃত্তির আক্র-মণ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। সংসারের সকল ব্যক্তিকেই আত্মবৎ দেখিতে পারিলেও এই বৃত্তি আর কোন অশান্তি উৎ-পাদন করিতে পারে না। তখন পরের সুখে আপনারই সুখ

বোধ হয়—পরের গৌরবে আপনাকেই গৌরবান্বিত মনে হয়।

যাহাহউক, যেরূপেই পার, উৎকৃষ্ট সুখলোভে ইচ্ছা থাকিলে, এই বৃত্তিটিকে তোমাদিগের সংযত করিতেই হইবে। একে ত মানুষের নিজের অভাবজনিত কত কষ্টই ভোগ করিবার সম্ভাবনা, তাহাতে যদি আবার পরের সুখ দেখিয়াও মানুষের তাহাতে কষ্ট পাইতে হয়, তবে তাহার কষ্ট দূর হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—অপরাপর বিষয়।

বিদ্যা।

এ সংসারে উৎকৃষ্ট সুখলাভের জন্য বিদ্যাশিক্ষা বিশেষ আবশ্যক। বিদ্যাশিক্ষার উপকারিতা বলিয়া শেষ করা যায় না। ফলতঃ মানবমাত্রেরই সর্ব্বপ্রথমে বিদ্যাশিক্ষার জন্য যত্নপর হওয়া কর্ত্তব্য।

যিনি বিদ্বান্, সর্ব্বত্রই তাঁহার সম্মান ও প্রতিপত্তি হইয়া থাকে। এই সম্মান ও প্রতিপত্তি সংসারে বড়ই সুখের জিনিস।

বিদ্যা অর্থোপায়ের ও উপায়স্বরূপ। বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিলে, রাজকীয় উচ্চ পদে অধিরূঢ় হইয়া যশ ও সম্মানের সহিত প্রভূত অর্থও উপার্জ্জন করা যায়। ফলতঃ দরিদ্র সন্তানের পক্ষে বিদ্যাশিক্ষা অর্থোপায়ের এক প্রকার সহজ উপায়, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কোন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে হইলে তাহাতে মূলধন আবশ্যক—দরিদ্রের পক্ষে সে মূলধন সংগ্রহ করা সহজ-

সাধ্য নহে। কিন্তু দরিদ্র ব্যক্তি কোন উপায়ে যদি বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারে, তবে তাহার আর্থিক উন্নতি অনেক পরিমাণে সুখসাধ্য হইয়া উঠে।

একমাত্র দরিদ্রেরই যে বিদ্যাশিক্ষা আবশ্যক, তাহা নহে। বিদ্যাশিক্ষায় আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হইয়া থাকে, সুতরাং সংসারের সকল লোকেরই বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। যিনি যে কার্য্যেই প্রবৃত্ত হউন—সকল কার্য্যেই বুদ্ধির আবশ্যকতা স্বীকার করিতে হইবে। রাজার রাজকার্য্য হইতে কৃষকের কৃষিকার্য্য পর্য্যন্ত সকল কার্য্যেই বুদ্ধি না থাকিলে ভাল ফল হয় না। এই বুদ্ধি বিদ্যাশিক্ষায় বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; সুতরাং যাঁহাদের অর্থ ও সম্মান আছে, তাঁহাদেরও বিদ্যাশিক্ষা একান্ত প্রয়োজনীয়।

বিদ্যাশিক্ষায় আরও এক অসাধারণ উপকার লাভ করা যায়। এই পৃথিবীতে মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই কেহ জ্ঞানলাভে সমর্থ হয় না। মানুষের কি কর্ত্তব্য, তাহা অবধারণ করিতে অনেক শিক্ষা ও অনেক সময় আবশ্যক। এই জ্ঞান লাভ করিতে অপরের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার সাহায্য লইতে হয়। বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা এই সাহায্য সহজপ্রাপ্য হইয়া থাকে। এই পৃথিবীতে যত প্রধান প্রধান ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া বিবিধ উপায়ে জ্ঞান বুদ্ধি অর্জ্জন পূর্ব্বক পরলোকগত হইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের সেই শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফল, নানাপ্রকার গ্রন্থাদি পাঠে অতি সহজেই লাভ করিতে পারা যায়। জীবিত ব্যক্তিগণের মধ্যেই বা কয় জনের সঙ্গে একটী লোকের সাক্ষাৎ

হওয়া সম্ভব ? কিন্তু বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা অনেকের চিত্তের ভাব বুঝিতে সমর্থ হওয়া যায়। মহাপুরুষগণ সময়ে সময়ে আমাদিগকে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, কল্যাণলাভার্থ আমাদিগের তাহা জ্ঞাত হওয়া একান্ত আবশ্যক। বিদ্যাশিক্ষা না করিলে ইহার কিছুই জানা সহজসাধ্য হইতে পারে না।

বিদ্যাশিক্ষা যেমন আমাদিগকে পরম্পরাসম্বন্ধে নানা প্রকার সুখের উপায় সংগ্রহ করিতে সমর্থ করিয়া থাকে, তেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধেও আমাদিগকে অল্পপরিমাণে সুখ প্রদান করিয়া থাকে না। গ্রন্থাদিপাঠজনিত সুখকে পৃথিবীর এক প্রকার শ্রেষ্ঠ সুখ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। এই জগতে অসংখ্য রহস্য বিদ্যমান আছে ; গ্রন্থাদিতে এই সকল রহস্য ব্যাখাত দেখিলে, যেমন জ্ঞান অর্জ্জিত হয়, তেমন সুখেরও উৎপত্তি হইয়া থাকে।

অধিক আর কি বলিব, বিদ্যাশিক্ষার উপকারিতা সহস্র মুখেও ব্যক্ত করা যায় না।

এই বিদ্যাশিক্ষার জন্য এখন তোমরা এখানে সমবেত হইয়াছ। কিন্তু তোমাদিগের মধ্যে দুই এক জনে ইহাকে বিশেষ কষ্টজনক ব্যাপার বলিয়াই মনে করিয়া থাকে। তাহারা মনে করে, এই স্কুলে যে কয়েক ঘণ্টা শিক্ষকের নিকটে থাকিতে হয়, ঐ সময়ে কত প্রকার ক্রীড়াজনিত আমোদলাভ হইতে পারে। সেই জন্য তোমাদিগের নিকটে বিদ্যাশিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে আমি কিছু বলা আবশ্যক মনে করিলাম।

একান্ত অধ্যবসায় ও প্রগাঢ় পরিশ্রম না হইলে কেহ সুচারুরূপে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারে না। অধুনা বিদ্যাশিক্ষার্থ কিছু

অর্থব্যয়ও আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু এমন দেখা গিয়াছে যে, ইচ্ছা ও অধ্যবসায় থাকিলে, অর্থহীনতা কাহারও বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে অন্তরায় হইতে পারে না।

ধন।

গৃহস্থমাত্রেরই সংসার যাত্রা নির্ব্বাহার্থ অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থ দ্বারা নানা প্রকার সুখের উপকরণও ক্রীত হইতে পারে। এই সকল কারণে সকলেরই অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করা আবশ্যক।

অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে হইলে, কোন না কোন প্রকারের কর্ম্ম অবলম্বন করিতে হয়। ইহার জন্য কেহ বা গবর্ণমেণ্টের অধীনে কার্য্য করিয়া থাকেন, কেহ বা গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন জমিদার, মহাজন প্রভৃতি অন্যান্য অর্থশালী ব্যক্তিগণের অধীনে কার্য্য গ্রহণ করেন, কেহ বা বাণিজ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া স্বাধীন ভাবে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই সকল কার্য্য কি প্রকারে অনুষ্ঠিত হইলে অভীষ্টফলপ্রদ হইতে পারে তৎসম্বন্ধে এই প্রবন্ধেই তোমাদিগকে কিছু বলিব।

কার্য্যাকার্য্য বিচার—অধ্যবসায়, পরিশ্রম ইত্যাদি।

কোন কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তাহার ফলাফল কিরূপ হইবার সম্ভাবনা, বিশেষরূপে বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। কার্য্য ভাল হইলেই যে তাহা সকলের পক্ষে সকল অবস্থায়

তুল্যরূপে অনুষ্ঠেয়, এরূপ নহে। যেমন কার্য্যের ভালমন্দ ফলের বিচার আবশ্যক, তেমনই সেই কার্য্যানুষ্ঠানে অনুষ্ঠাতার শক্তি ও আবশ্যকতা প্রভৃতিও সুন্দররূপে ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। অনেকে কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে এইরূপ কোন বিচার না করিয়া কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদিগের পরিণাম এই হয় যে, তাঁহারা কার্য্যানুষ্ঠানে অশক্ত হইয়া অসমাপ্ত অবস্থাতেই কার্য্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন; নতুবা, কার্য্য সমাপ্ত করিয়া নানা কারণে বিষম বিপজ্জালে জড়িত হইয়া পড়েন। এইরূপে অনর্থক তাঁহাদিগের সময় ও শক্তির অপচয় হইয়া থাকে এবং কার্য্যে সফলকাম না হওয়ায় তাঁহাদিগের মানসিক কষ্ট এবং অবসন্নতাও উপস্থিত হয়। অতএব যে কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা কর, অগ্রে তাহার ভাল মন্দ পরিণাম নিবিষ্টচিত্তে বিচার করিয়া দেখিবে।

বিচারান্তে যদি কোন কার্য্য অনুষ্ঠেয় বলিয়া বিবেচিত হয়, তখন তাহার অনুষ্ঠানে কৃতসংকল্প হইতে হইবে। সঙ্কল্প সুদৃঢ় হওয়া আবশ্যক। অদ্য কোন কার্য্যানুষ্ঠানে সঙ্কল্প করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইলাম, কল্য আবার তাহা পরিত্যাগ করিলাম, এইরূপ ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে সেই কর্ম্ম ফলপ্রদ হইতে পারে না। নিতান্ত অব্যবস্থিতচিত্ত ব্যক্তিগণই ঐরূপ প্রতি মুহূর্ত্তে এক সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া সঙ্কল্পান্তর গ্রহণ করেন। ফলতঃ তাঁহাদিগের কোন সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হয় না। সঙ্কল্প সুস্থির রাখিবার শক্তিকেই অধ্যবসায় বলে। কর্ম্মানুষ্ঠানে অধ্যবসায় একান্ত আবশ্যক।

যাঁহারা প্রতি মুহূর্ত্তে কর্ম্মের ফলের প্রতি সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টি-

পাত করেন, প্রায় তাঁহাদিগেরই এই অধ্যবসায় বিলুপ্ত হইয়া থাকে। যাহা কর্ত্তব্য, তাহার অনুষ্ঠানে চেষ্টা করিতে থাকিবে, ফলের প্রতিমুহূর্ত্তেই দৃষ্টিপাত করিবেনা। ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি যতদূর আবশ্যক, সে সম্বন্ধে চিন্তা যতদূর আবশ্যক, কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বেই তাহা করিতে হয়।

কার্য্যানুষ্ঠানে পরিশ্রম আবশ্যক। কোন প্রকার কার্য্যে শারীরিক পরিশ্রম, কোন প্রকার কার্য্যে বা মানসিক পরিশ্রম অধিক করিতে হয়। অত্যন্ত আলস্যপ্রিয় ব্যক্তির কোন কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। এ সম্বন্ধে তোমাদিগকে অন্যত্র বিস্তৃতরূপে বলিব।

কার্য্যতৎপরতায় ইংরাজ-জাতি আমাদিগের আদর্শস্থানীয়। তাহারা যেরূপ সুদৃঢ় সঙ্কল্পে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, যেরূপ অবিচলিত অধ্যবসায়, অসাধারণ সহিষ্ণুতা ও পরিশ্রম সহকারে কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ফলতঃ যেমন তাহাদের সাধনা, সিদ্ধিও সেইরূপ হইয়া থাকে। সুদূর সাগর-পার হইতে আসিয়া, কপর্দ্দকমাত্র সম্বল না আনিয়াও তাহারা অনায়াসে যেরূপ প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিতেছে, এতদ্দেশের অনেকেই প্রভূত মূলধন লইয়াও তাহা করিতে পারিতেছে না। সুদৃঢ় সঙ্কল্প, অবিচলিত অধ্যবসায়, প্রাণপণ পরিশ্রমই তাহাদের এই সিদ্ধির প্রধান কারণ বলা যাইতে পারে। ইংরাজ যখন যে কার্য্য করে, তাহার সমস্ত শক্তি, সমস্ত চিন্তা, সমস্ত শরীর, সমস্ত মন, তাহাতেই নিযুক্ত করিয়া থাকে। ইংরাজ প্রকৃতই কর্ম্মবীর। কেমন পরিশ্রমী, কেমন

ধীর, কেমন অধ্যবসায়ী, কেমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যাহা ইংরাজ একবার করিতে মনস্থ করিবে, তাহা সে করিবেই। কার্য্য-পথে যতই বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ততই তাহার চেষ্টা বাড়িতে থাকিবে। শরীর ও মনের ক্ষমতা অসীম, যতই তাহা বাড়াইতে থাক, ততই বাড়িতে থাকিবে। কর্ম্মধীর ইংরাজ কার্য্য দেখিয়া ভীত হয় না, বিপদ দেখিয়া পশ্চাৎপদ হয় না; প্রতিজ্ঞাপালনে এক একটি ইংরাজ যেন এক একটি ভীষ্মাবতার। কার্য্যানুষ্ঠানে তাহাদের এই দৃঢ়তা অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিবে। তোমাদের কার্য্যাকার্য্য তাহাদিগের কার্য্যাকার্য্য দেখিয়া স্থির করিবে না, কিন্তু কার্য্যতৎপরতা, কার্য্যানুষ্ঠান-প্রণালী তাহাদিগের নিকটই শিক্ষা করিবে। এমন জাজ্জ্বল্যমান সুন্দর আদর্শ অন্যত্র পাওয়া দুষ্কর। মানবমাত্রকেই প্রায় কার্য্য করিতে হইতেছে, ও আজীবন হইবে, সুতরাং সর্ব্বত্রই এই কার্য্যানুষ্ঠান-প্রণালী সযত্নে অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

মিতব্যয়।

অর্থসঞ্চয়ে আর একটী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। পূর্ব্বে যেরূপ কার্য্যানুষ্ঠানের কথা বলিয়াছি, অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় তদ্রূপ কর্ম্ম অবলম্বন করিলে অর্থোপায় হইতে পারে সত্য, কিন্তু অর্থ উপার্জ্জন করিলেই অর্থ সঞ্চিত হয় না। ব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে পর্য্যাপ্ত অর্থাগমেও অভাব দূর হয় না। তোমরা প্রায় সকলেই এ বয়সে ব্যয় করিতে বিশেষ ইচ্ছুক।

ইহার কারণ এই যে, তোমরা অর্থোপায়ের কষ্ট এখনও ভাল করিয়া অনুভব করিতে শিখ নাই—আর অর্থাভাবের যে কষ্ট তাহাও ভাল করিয়া বুঝিতে শিখ নাই। তোমরা মনে কর, অভাব হইলে মাতাপিতা বা অন্য অভিভাবকগণ তাহা পূরণ করিবেন, কিন্তু তাঁহাদের এজন্য যে কিরূপ কষ্ট, কিরূপ পরিশ্রমাদি করিতে হয়, তোমরা তৎপ্রতি দৃষ্টিক্ষেপ কর না। ইহা তোমাদের অনুচিত কার্য্য। এখন হইতেই তোমাদিগের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, অন্যের পরিশ্রমার্জ্জিত অর্থ তোমাদিগের বৃথা ব্যয় করা কর্ত্তব্য নহে। তোমরা অনেক প্রকারে এই অর্থের বৃথা ব্যয়ে অগ্রসর হও। নানা প্রকার ক্রীড়া কৌতুকে অর্থের অপব্যয় করিয়া থাক; নানা প্রকার দ্রব্যাদির অপচয় করিয়াও অর্থ নষ্ট করিয়া থাক। অধিক আর কি বলিব, এই যে তোমাদিগের পাঠ্য গ্রন্থাদি, ইহাও তোমরা অনেকে যত্ন করিয়া রাখ না। ইহার যে মূল্য আছে, তাহা তোমরা অনেকেই বুঝ না। সকল দ্রব্যেরই যে কিছু না কিছু মূল্য আছে, এইরূপ তোদিগের ধারণা থাকা আবশ্যক। যত্ন করিয়া ক্ষুদ্র পিনটি রাখিলেও কালে বিশেষ উপকার পাওয়া যাইতে পারে। জিনিসের এইরূপ প্রয়োজনীয়তা বুঝিলে অপব্যয়ের ইচ্ছাও অনেকটা কমিয়া যায়।

পরিজন, প্রতিবেশী, ইত্যাদি।

উৎকৃষ্ট সুখলাভার্থ উৎকৃষ্ট পরিজন চাই, উৎকৃষ্ট প্রতিবেশী চাই, উৎকৃষ্ট স্বদেশীও চাই। তোমরা বালক, তোমরা

কিছু শিক্ষা প্রদান করিয়া ইহাদিগকে উৎকৃষ্ট করিতে পার না। তোমাদিগের এসম্বন্ধে যাহা সাধ্য তাহাই আমি এখানে বলিতে চাহি।

তোমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহাদিগকে উৎকৃষ্ট করিতে আপাততঃ চেষ্টা করিতে পার না সত্য, কিন্তু পরম্পরা সম্বন্ধে ইহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার দ্বারা ইহাদিগকে অন্ততঃ তোমাদিগের সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট করিতে পার। সেই সদ্ব্যবহারের জন্য তোমাদিগের যে সকল গুণের বিকাশ ও দোষের বিনাশ করিতে হয় আমি তাহাই প্রথমে বলিব।

যাহাতে সকলের প্রিয় হওয়া যায়, তাহারই চেষ্টা করিলে, সকলেই তোমাদিগের উৎকৃষ্ট সুখপ্রাপ্তির অনুকূল হইতে পারেন। বাক্য ও কার্য্য দ্বারাই লোকের সহিত সাধারণতঃ প্রিয়াপ্রিয় সম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে।

বাক্য।

সত্যতা, সরলতা ও প্রিয়তা, এই সকল বাক্যের গুণ। অসত্যতা, কপটতা ও অপ্রিয়তা, এই সকল বাক্যের দোষ। বাক্যের এই দোষ-গুণ পর্য্যালোচনা করিয়া যিনি জিহ্বাকে সংযত করিতে পারেন, তিনি পৃথিবীর সকলেরই প্রিয় হইতে পারেন।

তোমরা যাহা বলিবে, তাহা সত্য হওয়া আবশ্যক। মিথ্যা বলিয়া জিহ্বাকে কলঙ্কিত করা উচিত নহে। লোকে যখন যাহা কিছু করে, তখন তাহা প্রায়ই সুখকর বলিয়া জ্ঞান

করিয়া থাকে। লোকে যখন মিথ্যা কথা বলে, তখন সেই মিথ্যা কথাতেই সে এক প্রকার না এক প্রকার সুখ বা সুবিধা বিবেচনা করে। দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। মনে কর, তোমরা কোন অপরাধ করিয়াছ, আমি তোমাদিগকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম। তোমরা মনে করিলে, যদি অপরাধ স্বীকার কর, তবে তোমাদিগকে আমি কটু কহিব—কি তোমাদিগের প্রতি আমি অসন্তুষ্ট হইব—তাই তোমরা মিথ্যা কথা কহিলে। কেন কহিলে ? না—তোমরা দেখিলে, সত্য কহিয়া বিরাগভাজন হওয়া অপেক্ষা মিথ্যা কহাই সে স্থলে সুখকর। এইরূপ বিচার করিয়া দেখিও—প্রায় লোকেই সুখকর মনে করিয়াই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকে। লোকে যে মিথ্যা গল্প করে, তাহাও প্রায় এই জন্য। সত্য কহিলে তাহার বাক্‌পটুতা বা অভিজ্ঞতা বিশেষ প্রকাশিত হয় না, তাই সে নানা প্রকার কল্পনা করিয়া অতিরঞ্জিত করিয়া মিথ্যা কথা বলিয়া থাকে। যদি মিথ্যাকথাজনিত এই সুখ পরিণামে কোন প্রকার দুঃখ আনয়ন না করিত, তবে না হয় মিথ্যাই বলা যাইত; কিন্তু তাহা ত নয়—এ মিথ্যা যখন প্রকাশিত হয়, সাতিশয় কষ্ট, ক্ষতি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়; এ সত্য না জানে এমন লোকও নাই। তথাপি লোকের এই মত্ততা ও অদূরদর্শিতা এবং আপাতসুখকর কার্য্যে এতই আসক্তি যে, তাহারা মিথ্যা কথার প্রলোভন সহজে পরিত্যাগ করিতে পারে না।

মিথ্যা কহার কি দোষ, তাহা সেই বাঘ ও রাখালের গল্পে যতটা বুঝিয়াছ, তদপেক্ষা বেশী আমি বুঝাইতে পারিব না

মিথ্যা কহার দোষ সম্বন্ধে সেই গল্পটী মনে রাখিও। সেই গল্পে দেখ, রাখাল কেবল কৌতুক দেখিবার জন্যই মিথ্যা কথা কহিয়া সেইরূপ ফল প্রাপ্ত হইল; যাহারা প্রবল স্বার্থসিদ্ধির জন্য মিথ্যা কথা কহিয়া থাকে, তাহারা কিরূপ ফল পাইতে পারে, অনুমান করিয়া দেখিতে পার। একটা কথা তোমা-দিগকে আমি বলিয়া দিতেছি। মিথ্যাটাকে চিরদিন সত্যের আচ্ছাদনে আবৃত রাখা যায় না। রাজাধিরাজ মহারাজ চক্র-বর্ত্তীই চেষ্টা করুন—কি ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ সর্ব্বপূজ্য কোন মনস্বীই চেষ্টা করুন, মিথ্যাকে চিরদিন সত্যের আবরণে লুকায়িত রাখিতে কেহ সমর্থ হইবেন না। যদি এই ধারণা হৃদয়ে বদ্ধ-মূল করিতে পার, তবে বোধ হয়, মিথ্যা কহার আসক্তি অনেক কমিয়া যাইবে।

যাহা বলিবে তাহা বেশ সরল হওয়াও চাই। কথার উদ্দেশ্য, তদ্দারা অন্যকে নিজের মনের ভাব জ্ঞাপন করা। সুতরাং যাহাতে সে কথা অন্যে বুঝিতে পারে, সেই চেষ্টা থাকা চাই। তোমরা হয় ত মনে কর যে, শব্দাড়ম্বর থাকিলে কথা অসরল বা কঠিন হয়, আর তাহা না থাকিলেই কথা সহজ বা সরল হয়; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। শব্দাড়ম্বর থাকিলে কথা অবোধ্য হইতে পারে, কিন্তু আমি যে অসরল কথার কথা বলিয়াছি, তাহা সেরূপ অবোধ্য কথা নহে। যেখানে কথার মধ্যে জটিলতা বা গুপ্ত কোন ভাব বা দ্বিভাব প্রভৃতি থাকে, সেইখানে সহজ কথাও অসরল হয়। মনে কর, আমি যেন তোমাদিগকে কোন বই পড়িতে দিয়াছি; বইখানি তোমরা

আরম্ভ ও উপসংহারই পড়িয়াছ, কিন্তু আমি যখন জিজ্ঞাসা করিলাম—'কেমন হে বইখানা পড়িয়াছ?' তোমারা উত্তর করিলে—"হাঁ মহাশয়! আদ্যোপান্তই পড়িয়াছি।" তোমরা মনে করিতে পার, তোমরা সত্য উত্তরই করিয়াছ, কিন্তু আমি সে কথার যেরূপ অর্থ বুঝিলাম, তাহা কিন্তু সত্য নহে। এরূপ স্থলে এই কথা অসরল হইল। এই কথা যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাকে প্রতারণা করিবার জন্য বল, তবে তোমরা অসরল ভাবে কথা বলিলে, আমি এইরূপ বলিব। বুঝিলে? বাক্যের সত্যতা যেমন গুণ, সরলতাও তেমনই গুণ। যাহা বলিবে, তাহার অর্থ যেমন সত্য হওয়া আবশ্যক, তাহাতে যে ভাব প্রকাশ হইতে পারে, তাহাও সত্য হওয়া তেমনই আবশ্যক। সত্যের আবরণে কোন মিথ্যাকে ঢাকিলে তাহাকে অসরলতা বলে।

নীতিবিদ্গণ বলেন, সত্য কথা কহিবে প্রিয় কথা কহিবে, সত্য অপ্রিয় কথা কহিবে না। ইহার অবশ্য এরূপ অর্থ নহে যে যখন অপ্রিয় সত্য কথা বলিতে হইবে তখন সেই সত্যটীকে মিথ্যার আবরণে প্রিয় করিয়া লইয়া বলিতে হইবে। ইহার অর্থ এই যে. বিশেষ আবশ্যক না হইলে, অপ্রিয় বাক্য সত্য হইলেও বলিবে না। লোকে কিরূপ অনাবশ্যক অপ্রিয় সত্য কথা বলে, তাহা তোমাদিগকে বুঝাইতেছি। আমি যদি এই রামচন্দ্রকে বলি, 'রামচন্দ্র দেখিতে কুৎসিৎ', এ কথাটী সত্য হইলেও বড় অনাবশ্যক অপ্রিয় কথা হইল। এ কথা বলাতে আমার এমন কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না যে, উহা না বলিলে কোনরূপ ক্ষতি হইতেছিল—এইরূপ স্থলে

আমি ঐরূপ অপ্রিয় কথা বলিলে, রামচন্দ্রকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া হয়।

অপ্রিয় বা কর্কশ বাক্যে লোকে যেমন সাধারণের বিরাগ-ভাজন হয়, এমন বোধ হয় আর কিছুতেই নহে। সহস্র অন্য গুণ থাকিলেও, কর্কশভাষী ব্যক্তি কদাচ লোকের শ্রদ্ধা বা ভালবাসা আকর্ষণ করিতে পারিবে না। এমন দৃষ্টান্ত তোমা-দিগকে আমি অনেক দিতে পারি। লোকে বলিয়া থাকে যে, মিষ্টদ্রব্য অন্যকে প্রদান করিতে অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু মিষ্ট-বাক্য সকলেই সকলকে দিতে পারে; ইহাতে অর্থের প্রয়োজন নাই। এই মিষ্টবাক্য বিতরণে যিনি কুণ্ঠিত, তাঁহাকে লোকে ভালবসিতেও কুণ্ঠিত না হইবে কেন? অতএব যত্নপূর্ব্বক জিহ্বাকে সংযত করিয়া কর্কশবাক্য পরিহার করিবে।

ব্যবহার।

যেমন বাক্য সত্য, সরল ও প্রিয় হওয়া আবশ্যক, তেমনই ব্যবহারাদি ও সুনীতিসম্মত, সরল বা অকপট এবং অপরের প্রিয় হওয়া আবশ্যক।

যখনই যাহা করিবে, তাহা সুনীতিসম্মত হওয়া আবশ্যক। সচরাচর কার্য্যের এই গুণ থাকিলেই ইহার অন্য দুইটী গুণ আনুষঙ্গিক ভাবে আসিয়া পড়ে। অর্থাৎ কার্য্য সুনীতিসম্মত হইলেই তাহা প্রায় সরল ও অপরের প্রিয় হইয়া থাকে। কিন্তু দুই এক সময়ে ইহার অন্যথাও না হয়, এমন নহে। যখন গুরুজন কোন সুনীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে আদেশ করেন,

তখনই বিশেষ বিবেচনা আবশ্যক। একদিকে গুরুজনের অপ্রিয়সাধনের ভয়—তাহাও সুনীতিবিরুদ্ধ—আর একদিকে সত্যের নিয়মলঙ্ঘনের ভয়—তাহাও ধর্ম্মবিরুদ্ধ। এরূপ স্থলে তোমরা প্রথমে চেষ্টা করিয়া দেখিবে, যাহাতে কোন প্রকার অন্যায়ানুষ্ঠান না করিতে হয়। এইরূপ চেষ্টা করিলে, অনেক সময়েই কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়, ইহাই আমার বিশ্বাস। দুই এক স্থলে সহসা কৃতকার্য্য না হওয়াও অসম্ভব নহে। সেই সব স্থলে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক কাজ করিতে হইবে। ঔদ্ধত্য দেখাইয়া কখনও গুরুজনকে অপমানিত করিবে না—আবার বিশেষ সুনীতিবিরুদ্ধ কোন কার্য্যও কদাচ করিবে না। উভয়েরই সামঞ্জস্য বিধান করিয়া গুরুজনের সম্মান রাখিতে হইবে।

তোমরা যাহা নহ, অপরকে তাহাই বলিয়া বিশ্বাস জন্মাইতে যদি কোন কার্য্য কর, তাহা অসরল বা কপট কার্য্য হইবে। এইরূপ অসরল বা কপট কার্য্য যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে; কারণ ইহার পরিণাম প্রায়ই বড় কষ্টদায়ক। যখন যে কার্য্য করিতে উদ্যত হইবে, বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিবে, সেই কার্য্যটীর মধ্যে কোন দুরভিসন্ধি আছে কি না। এই বিশ্লেষণ বা বিচার করিয়া দেখিতে অভ্যাস করিলে, তোমাদিগের কার্য্য ক্রমে সরল ও অকপট হইতে থাকিবে। এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিতে চাহি না।

অনুষ্ঠিত কার্য্য যেমন সরল ও সুনীতিসম্মত হওয়া আবশ্যক, তেমনি তাহা অন্যের প্রিয় হওয়াও আবশ্যক। এই জন্য

আপনার আপাতসুখেচ্ছা ত্যাগ করিয়া অপরের সুখের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। অপরের নিকট সর্ব্বদা আত্মাভিমান বিসর্জ্জনপূর্ব্বক নম্র থাকিতে হইবে। অপরের অন্যায়াচরণ বা অপরাধ সহিতে বা ক্ষমা করিতে হইবে। অপ-রের নিকটে সামান্য অপরাধ করিলেও তজ্জন্য বিশেষ দুঃখিত হইতে হইবে ও যাঁহার নিকটে অপরাধ করা হইবে, তাঁহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা বা অকুণ্ঠিতভাবে অপরাধ-স্বীকার করিতে হইবে। যথাক্রমে ইহা তোমাদিগকে বলিতেছি।

আপনার আপাতসুখেচ্ছা ত্যাগ করিয়া অপরের সুখের জন্য চেষ্টা করা।

কথাটা বুঝিতে কিছু গোল হইতে পারে। "সুখ লাভই হইল কার্য্যের উদ্দেশ্য, তবে যদি তাহাই ত্যাগ করিতে হইল, তবে সে কার্য্যে লাভ ?" এই আপত্তি বুঝিয়া আমি 'আপাত' কথাটা ব্যবহার করিয়াছি। সুখলাভ ইহার উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু সে সুখ ত উৎকৃষ্ট হওয়া চাই। আজ খানিকটা সুরস দ্রব্য আহার করিয়া সুখলাভ করিলাম—কাল তজ্জন্য উদর স্ফীত হইলে ভয়ানক কষ্ট হইবে, ইহা কি বাঞ্ছনীয় ? অন্যের সহিত ব্যবহারে আপনার আপাতসুখত্যাগের চেষ্টাতে মূলতঃ আপ-নার সুখই হইয়া থাকে।

নিজের ইচ্ছামতে চলিতে আপাততঃ বড় সুখ বোধ হয়। গুরুজনের আজ্ঞাদি প্রতিপালন করিয়া, তাঁহাদিগের সন্তোষ সাধন করিতে হইলে, এই নিজের ইচ্ছাটি দুই এক স্থলে

পরিত্যাগ করিতে হয়। ইহা এক প্রকার কষ্টজনক সন্দেহ নাই, কিন্তু এই কষ্ট আপাত-কষ্ট ; এই কষ্টের ফলে, গুরু-জনের প্রিয় হওয়া যায়। গুরুজনের প্রিয় হইলে, তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে ও স্নেহে অসীম আনন্দ লাভ করা যায়। এ স্থলে এই যে নিজের ইচ্ছামতে চলার আপাতসুখ, তাহাকে ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। প্রায় উৎকৃষ্ট সুখজনক কার্য্যেরই আরম্ভে কষ্ট পাইতে হয়, আপাতসুখকে বিনাশ করিতে হয় ; কিন্তু পরিণামে তাহাতে উৎকৃষ্ট সুখই ভোগ করিতে পারা যায়। এই লেখাপড়া শিক্ষার কথাটাই দেখ না কেন। বালকেরা যে বয়সে লেখাপড়া করিতে আরম্ভ করে, সে বয়সে খেলাই তাহা-দের প্রধান সুখ বলিয়া বিবেচিত হয়। তখন তাহারা খেলা ছাড়িয়া লেখাপড়া করিতে চেষ্টা করিয়া কি উপস্থিত সুখ পরি-ত্যাগ করে না ? রোগীর পথ্য উপস্থিত সুখবিরোধী—কিন্তু তাহার পরিণাম মঙ্গলজনক বলিয়া কি তাহা সেবনীয় নহে ? সেইরূপ যদিও গুরুজনের আধীনতা বা তাঁহাদের জন্য আত্ম-সুখের বিসর্জ্জন আপাততঃ কষ্টজনক বলিয়া বোধ হয়, তবু তাহা পরিণামে মঙ্গলজনকই জানিবে।

ভক্তির কথা বলিবার সময়ে বলিয়াছি যে প্রকৃত ভক্তি-গুণের বিকাশ করিতে পারিলে, ভক্তির পাত্রের আজ্ঞা প্রতি-পালনে কিছুমাত্র কষ্ট বোধ হয় না ; প্রত্যুত তাহাতে আনন্দই হইয়া থাকে।

পরের আজ্ঞা প্রতিপালনে তোমাদের শারীরিক কষ্ট হইতে পারে। এই কষ্ট সহ্য করিবার জন্য পরিশ্রমী হইতে হইবে।

পরার্থপরতা যেমনই লোককে অপরের প্রিয় করিয়া থাকে, স্বার্থপরতা তেমনই লোককে অপরের অপ্রিয় করে। মানুষ কখন কোথাও একা থাকিতে পারে না। তাহাকে অপর লোকের সহিত সম্বন্ধ রাখিতেই হয়। অপরের সহিত ব্যবহারে যদি লোকে কেবল আপনার ভালটাই খুঁজিতে থাকে, তবে তাহাকে অপরে ভাল বাসিবে কেন?

শরীর যদি উৎকৃষ্ট থাকে, তবে তাহাকে সহজেই পরিশ্রমসহিষ্ণু করা যাইতে পারে। শরীর পরিশ্রমসহিষ্ণু হইলে, অন্যের আজ্ঞাপ্রতিপালনজনিত শারীরিক কষ্টের দায় হইতেও মুক্তিলাভ করা যায়। কাহারও জন্য শারীরিক পরিশ্রম করিলে সেজন্য সে যেমন সন্তুষ্ট হয়, সহজে আর কিছুতেই সে তেমন সন্তুষ্ট হয় না। অর্থাদি দ্বারাও লোকের এমন সন্তোষ সাধন করা যায় না। কাহাকেও আত্মসুখবিসর্জ্জন করিতে দেখিলে, তাহার প্রতি অপরের স্বভাবতঃই শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জন্মিয়া থাকে। তবেই দেখ, যেমন ইহাতে একটি উপস্থিত সুখ বিসর্জ্জন করিতে হয়, তেমনই—তেমনই কেন, বোধ হয় ততোধিক—একটি সুখের সামগ্রী তৎক্ষণাৎ লাভ হয়। এইরূপে পয়সা ব্যয় করিয়া যদি তদ্‌বিনিময়ে টাকা পাওয়া যায় তবে কোন্ বুদ্ধিমান্ মহাজন এ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে পারেন?

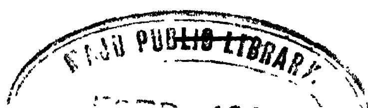
অপরের নিকট আত্মাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নম্র থাকা।

নম্রতায় লোক যত বাধ্য হয়, এত আর কিছুতেই নহে। অতি বড় পাপকর্ম্ম করিয়াও নরম হইয়া থাকিলে লোকে তাহাকে দয়া করে। লোকের সাধারণতঃ অহঙ্কার বা অভিমান বেশী মাত্রাতেই থাকে। অহঙ্কারে আপনাকে অপর হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ধারাণা জন্মায়। অন্যের অহঙ্কার আবার এই ধারাণার বিরোধী—কাজেই লোকে অন্যের অহঙ্কারের প্রতি বড়ই চটা। লোকের নিকট নরম হইয়া থাকিতে পারিলে যে সহস্র অপরাধও মার্জ্জনীয় হয়, এ কথা নির্ব্বিবাদে বলা যাইতে পারে। অতএব সর্ব্বাগ্রে তোমাদিগের চরিত্রে এই গুণের বিকাশ জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। নিষ্কলঙ্ক হইতে চেষ্টা করা উচিত বটে, কিন্তু নিষ্কলঙ্ক হওয়া তত সম্ভবপর নহে—সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও দুই একটা দোষ প্রায় সকলেরই থাকে। সুতরাং নিখুঁত হইয়া অন্যের প্রিয় হইতে চেষ্টা করিয়া বিশেষ কৃতকার্য্য হওয়া তত সহজ নহে। সেই হেতু আমি সহজে লোকের প্রিয় হওয়ার জন্য এই গুণের বিকাশ করিতে বিশেষ উপদেশ প্রদান করিতেছি।

আপনার গুণ যিনি বেশী দেখিতে চেষ্টা করেন, তিনিই প্রায় অহঙ্কারী—আপনার দোষ যিনি বেশী দেখিয়া থাকেন, তিনিই প্রায় প্রকৃত নম্র। সামাজিক ব্যবহারে যে নম্রতা দেখিতে পাও, তাহাকেই অকৃত্রিম নম্রতা মনে করিও না; লোকে উহাতেই সন্তুষ্ট থাকে বটে; কিন্তু সে সন্তোষে মূল জিনিষের

মূল্যই জ্ঞাপন করিয়া থাকে। যাহার নকলেরও এত আদর, তাহার আসলের মর্য্যাদা কি, ভাবিয়া দেখ। লোকে ব্যবহারে যে নম্রতা প্রদর্শন করে, তাহা সকল সময়ে আন্তরিক নহে। তবু অন্ততঃ ইহা ব্যবহারের নম্রতা সাধন করিয়াছে, বাক্যের নম্রতা সাধন করিয়াছে, এই জন্যও কিছু আদর পাইবার যোগ্য। আমি তোমাদিগকে এই প্রকার নম্রতার বিকাশ করিতে বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে চাহি না। তোমাদিগকে আন্তরিক নম্রতারই বিকাশ করিতে হইবে। এজন্য সর্ব্বদা মনে করিবে, 'আমি সহস্র দোষে দোষী, আমি পৃথিবীতে একটী নগণ্য প্রাণী,—আমার আবার অহঙ্কার কিসের ?' এই নম্রতাগুণের বিকাশ-জন্য সর্ব্বদা পরের গুণ ও নিজের দোষ দেখিতে যত্নবান্ হইতে হইবে। ভ্রমরের পুষ্পমধু অন্বেষণের ন্যায়, পরের গুণই অন্বেষণ করিবে; আর মক্ষিকার ব্রণানুসন্ধানের ন্যায়, নিজের দোষই সর্ব্বদা খুঁজিয়া বেড়াইবে। এইরূপ করিতে করিতে দেখিবে, নিজের গুণগরিমার প্রতি ক্রমশঃ বিশ্বাস কমিয়া আপনার অহঙ্কার কমিয়া যাইতেছে, এবং পরের গুণগরিমায় ক্রমশঃ বিশ্বাস জন্মিতেছে ও তৎসঙ্গে তৎপ্রতি শ্রদ্ধাও বৃদ্ধি পাইতেছে। এইরূপে ক্রমে পরকে বড় ভাবিতে শিখিবে, নিজকে ছোট ভাবিতে আরম্ভ করিবে। ফলতঃ নিজের এই ক্ষুদ্রতাজ্ঞানই নম্রতাবিকাশের প্রধান সহায়।

নম্রতার বিপরীত গুণ অহঙ্কার বা ঔদ্ধত্য ইত্যাদি।



অপরের অন্যায়াচরণ সহ্য করা বা ক্ষমা করা।

অপরের প্রিয় হইতে হইলে, এই ক্ষমাগুণের বিকাশ বিশেষ আবশ্যক। আমি যেন চেষ্টা করিয়া কাহারও নিকটে কোন অপরাধ না করিয়া থাকিতে পারিলাম,—অপরের আমার নিকট অপরাধী হওয়া অসম্ভব নহে। অন্যকৃত সেই অপরাধগুলি ক্ষমা করিতে না পারিলে অপরাধকারী ব্যক্তিও আমাকে অপ্রিয় জ্ঞান করিবেন। এমনই সংসারের রীতি আমি তোমাদিগের নিকটে একটা অপরাধের কার্য্য করিলে, যদি তোমরা আমার সে অপরাধ ক্ষমা না করিয়া, অপরাধীর সহিত যেরূপ আচরণ করিতে হয়, আমার সহিত সেইরূপ আচরণ কর, তবে আমি আমার অপরাধের কথা বিস্মৃত হইব, এবং তোমাদিগের প্রতিই অসন্তুষ্ট হইব।

এই ক্ষমা কথাটি সকলের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। গুরুজনে যখন আমাদিগের প্রতি অন্যায্য ব্যবহার করেন, তাহা সহ্য করিয়া থাকিতে হইবে। সমকক্ষ বা নীচব্যক্তিকৃত অন্যায়াচরণ ক্ষমা করিতে হইবে। বিষয়টা একই—কেবল কথায় পৃথক মাত্র।

ক্ষমাগুণের বিকাশ করিতে হইলে, আপনাকে সহিষ্ণুতাগুণে ভূষিত করিতে হইবে। যিনি অসহিষ্ণু, তিনি ক্ষমা করিতে ইচ্ছুক হইলেও, ক্ষমা করিতে সমর্থ হন না। অন্যায্য ব্যবহার দেখিবামাত্র তাঁহার শরীর জ্বলিয়া উঠে—তাঁহার ঘোরতর ক্রোধের উদ্রেক হয়। এই ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া হয় ত তিনি যাঁহাকে

ক্ষমা করিবেন, তাঁহারই নিকটে ক্ষমাপ্রর্থনা করিবার উপযুক্ত হইয়া উঠেন—অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রথমে তাঁহার নিকটে অপরাধী ছিলেন, সেই ব্যক্তির নিকটে পরে তিনিই অপেক্ষাকৃত অধিকতর অপরাধী হইয়া পড়েন।

সে যাহা হউক, পরের প্রিয় হইয়া চলিতে হইলে পরকৃত অপরাধগুলি সহ্য করিয়া থাকিতে হইবে—নহিলে পরের মন সন্তুষ্ট রাখিতে পারা যাইবে না। পরের মন সন্তুষ্ট না রাখিতে পারিলে, উৎকৃষ্ট সুখলাভে ব্যাঘাত জন্মিবে।

অপরের নিকট অপরাধ স্বীকার করা—বা ক্ষমা প্রার্থনা করা।

সহস্র চেষ্টা করিলেও, একেবারে যে দোষশূন্য হইতে পারিবে, মনে এরূপ আশা করিও না। কতক ইচ্ছায়, কতক অনিচ্ছায়, অন্যের নিকটে অপরাধ করিতেই হইবে। অপরাধ না করিবার চেষ্টা সত্ত্বেও যদি কাহার নিকটে অপরাধ করিতে হয়, আমি সে জন্য তোমাদিগকে বিশেষ তিরস্কার করিব না। কিন্তু যদি সেই অপরাধ করিয়া তোমরা চুপ করিয়া বসিয়া থাক, সেজন্য কিছুমাত্র দুঃখিত না হও, বা ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক না হও, আজি যাঁহার নিকট অপরাধ করিয়াছ, তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা, স্থলবিশেষে অপরাধস্বীকার বা দুঃখপ্রকাশ না কর, আমি তোমাদিগকে দুর্জ্জন বলিয়া তিরস্কার করিতে উদ্যত হইব।

এমন অনেক লোক দেখিয়াছি, যাঁহারা অন্যের নিকটে অপরাধ করিয়া মনে মনে অনুতাপ ভোগ করেন—কিন্তু যাঁহার

নিকট অপরাধের কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাকে ইহা জানাইবার আবশ্যকতা বোধ করেন না। তাঁহারা মনে করেন, মনে মনে অনুতাপ ভোগ করিলেই অপরাধের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত হইল; আমি কিন্তু এরূপ মনে করি না। যাঁহার নিকটে অপরাধ করিলাম তিনি যদি গুরুজন হন, তাঁহার নিকট বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার মন প্রফুল্ল করিতে চেষ্টা করিতে হইবে সমকক্ষের নিকটে—ব্যক্তি বুঝিয়া কাহারও নিকটে বা ক্ষমা-প্রর্থনা, কাহারও নিকটে বা অপরাধ স্বীকার, কাহারও নিকটে বা তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে।

রাজা।

রাজা উৎকৃষ্ট না হইলে, প্রজাবর্গের কষ্টের অবধি থাকে না। রাজাই দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া প্রজাবর্গের সুখশান্তি বিধান করিয়া থাকেন—সুতরাং উৎকৃষ্ট সুখলাভার্থ উৎকৃষ্ট রাজা নিতান্ত আবশ্যক।

তোমরা সকলেই জ্ঞাত আছ, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর সপ্তম এডওয়ার্ড আমাদের রাজা। এই প্রকার উৎকৃষ্ট রাজা সচরাচর সকলের অদৃষ্টে ঘটে না।

কিন্তু রাজা উৎকৃষ্ট হইলেই প্রজার সুখশান্তি ঘটে না। যেমন রাজা উৎকৃষ্ট, তেমনই প্রজাও উৎকৃষ্ট হওয়া চাই। যেমন রাজা পুত্রের ন্যায় প্রজাপালন করিবেন, তেমনই প্রজাগণও পিতার ন্যায় রাজাকে ভক্তি করিবে। রাজা প্রজার এই সম্বন্ধ—এই পিতাপুত্রের সম্বন্ধ যে দেশে বর্ত্তমান, সেই দেশেই

প্রজাগণ উৎকৃষ্ট রাজা পাওয়ার সুখ সমধিক সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয়।

রাজাকে ভক্তি করিতে হইবে; তাঁহার বিধানগুলি প্রাণপণে পালন করিতে হইবে। রাজা যে বিধান করিলেন, প্রজা যদি তাহা পালন না করে, তবে রাজার প্রতি প্রজার ভক্তি রহিল কই? তাই সর্ব্বাগ্রে তোমাদিগের এই রাজার বিধান-পালনে মনোযোগী হইতে হইবে। যেমন তোমরা পরিবার মধ্যে থাকিয়া পিতা বা অন্য কোন গুরুজনের আদেশ পালন করিয়া থাক, যেমন তাঁহাদিগের আদেশ লঙ্ঘন করিলে, তাঁহারা তোমাদিগকে যে শাস্তি প্রদান করিয়া থাকেন, তোমরা সেই শাস্তি অম্লানবদনে গ্রহণ করিয়া থাক—এই রাজার আদেশ স্বরূপ তৎপ্রচলিত আইনাদির বিধানও তোমাদিগকে সেইরূপই পালন করিতে হইবে—সেই বিধান লঙ্ঘন করিলে রাজা যদি তোমাদিগকে শাস্তি প্রদান করেন, তোমাদিগকে ঠিক্ তেমনই অম্লানবদনে সেই শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে। রাজার প্রচারিত আইনের বিধান পালন করিয়া প্রজাগণের রাজভক্তি প্রদর্শন করিতে হয়।

যেমন আপনারা রাজার সেই আইনের বিধান মানিতে যত্ন করিবে, তেমনই অন্যেও যাহাতে সেই বিধান পালন করে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। যদি রাজা সেইরূপ কোন বিধানের লঙ্ঘনকারীকে শাস্তি দিতে সমুদ্যত হন, কদাচ তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া রাজাকে শাস্তি প্রদানে বাধা দিও না। রাজার নিকটে কাঁদিয়া কাটিয়া স্বীয় দোষ স্বীকার করিয়া,

শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাইতে চেষ্টা করিতে পার, কিন্তু কদাচ কুটিল, মিথ্যা ও শঠতাপূর্ণ যড়্‌যন্ত্রে, রাজার সুবিচার কার্য্যে বাধা দেওয়া, ভক্ত প্রজার কর্ত্তব্য নহে। যেমন শিষ্টের পালন রাজার ধর্ম্ম ; তেমন দুষ্টের দমনও রাজার ধর্ম্ম। রাজার সহিত ব্যক্তিগত কোন অপরাধীর কোন শত্রুতা নাই। রাজা যে অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করেন, তাহা তোমাদেরই মঙ্গলের জন্য। রাজদত্ত শাস্তি অপরাধীরও মঙ্গলজনক। অতএব রাজ-ভক্ত প্রজা যেমন যত্নে রাজার শিষ্টপালন কার্য্যে সহায়তা করিবেন, তেমনই দুষ্টদমনকার্য্যেও যথাশক্তি সাহায্য করিবেন। রাজা বড় দূরে আছেন ; অপরাধী প্রায়ই তাঁহার সম্মুখে অপরাধ করে না। অপরাধী প্রায় তোমাদিগের সম্মুখেই সেই অপরাধের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে ; অতএব তোমরা যদি সকলে যত্নবান্ হইয়া এই অপরাধীর অপরাধগুলি রাজদ্বারে প্রকাশিত না কর, তবে আর রাজা দুষ্টের দমনরূপ প্রধান কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিবেন না। সেই কর্ত্তব্যলঙ্ঘনফলে, রাজার রাজ্য বিশৃঙ্খল হইবে, প্রজাগণের শাস্তি তিরোহিত হইবে। অতএব তোমরা যথাসাধ্য রাজার শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমনে সহায়তা করিবে।

যেমন রাজাকে ভক্তি করিবে, তেমনই রাজার প্রতিনিধিকেও ভক্তি করিবে। মহামান্য গবর্ণর জেনেরল রাজার প্রতিনিধি— তাঁহাকে ত সকলে সম্মান করিয়াই থাক। তাঁহাকে যে সম্মান করা কর্ত্তব্য, তাহা সকলে সহজেই বুঝিতে পার ; কিন্তু এমন অনেক রাজপুরুষ আছেন, যাঁহাদিগকে সম্মান করা তোমরা

অনেক সময়ে কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতে পারে না। সেইজন্য বলা আবশ্যক যে, রাজার রাজকার্য্যে যিনিই সহায়তা করিবেন, তোমরা তাঁহাকেও ভক্তি করিবে।

তোমরা বালক—এ সকল কথা এখন না বলিলেও চলিত —কিন্তু এত বড় একটা বিষয়ের কিছু জ্ঞান বাল্যকালেই হওয়া উচিত মনে করিয়া এ সম্বন্ধে দুই চারি কথা এই স্থলেই সংক্ষেপে বলিলাম।

আমাদের বর্ত্তমান মহারাণীর গুণের অবধি নাই। প্রজার দুঃখের কাহিনী শুনিলে, তাঁহার হৃদয় করুণায় দ্রবীভূত হয়। যখন দেশে দুর্ভিক্ষ বা মহামারী উপস্থিত হয়,মহারাণী ভারতেশ্বরী প্রজার কষ্ট নিবারণ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারতের প্রজাবর্গের সুশিক্ষা বিধানার্থ বৎসর বৎসর কত অর্থ ব্যয় করিতেছেন, তাহা দেখিলে কৃতজ্ঞতায় হৃদয় প্লাবিত হইয়া উঠে। আমাদের দেশে দীন দরিদ্রের চিকিৎসার জন্য অর্থব্যয় হইতেছে না। কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাঁস-পাতালে কপর্দ্দক মাত্রও প্রদান না করিয়া যে কত শত দীন দরিদ্র অতিযত্নে বিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। রাজা নিজ ভাণ্ডার হইতেই যে অর্থানুকুল্য করিয়া থাকেন, এমন নহে। টাকা যেখান হইতেই আসুক, রাজার দৃষ্টি না থাকিলে, এমন কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না। ফলতঃ আমাদিগের সুখশান্তির জন্য রাজা সর্ব্বদাই চিন্তা করিতেছেন। এ হেন রাজার নিকট সর্ব্বদা অভিযুক্ত না থাকিলে ঈশ্বরের নিকটেও পরম পাপী বলিয়া গণ্য হইতে হইবে।

সর্ব্বপ্রাণীর সুখ।

দয়া।

উৎকৃষ্ট সুখলাভার্থ কেবল নিজের সুখদুঃখের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই চলে না, এ কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি। যাহাদিগের সহিত তোমাদিগের কোন না কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখিতে হয়, সকলেরই উৎকৃষ্ট হওয়া বা অন্ততঃ তোমাদিগের অনুকূল হওয়া আবশ্যক। পরিজনের সহিত সম্বন্ধ সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী—তাহাদিগকে তোমাদের সুখপ্রাপ্তির অনুকূল করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। কিরূপে তাহা করিতে হয়, স্থূলভাবে বলিয়াছি। প্রতিবেশী ও স্বদেশীর সহিত সম্বন্ধ—পরিজনের সহিত সম্বন্ধ অপেক্ষা দূরবর্ত্তী—কিন্তু তথাপি তাহাদিগের সহিতও অনেক প্রকার সংশ্রব রাখিতে হয়—তাহাদিগকেও শিষ্টাচার ও সৌজন্যাদি দ্বারা তোমাদিগের অনুকূল করিতে হইবে। এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিলেও, সুখের অন্য এক প্রকার অন্তরায় থাকিয়া যায়, তাহাই অদ্য বলিতে চাহি।

অপরের দুঃখ দেখিলে, আমাদিগের মনে স্বতঃই কষ্ট উপস্থিত হইয়া থাকে। এই কষ্ট দূর করিবার জন্য অপরের দুঃখদূরের চেষ্টা উৎকৃষ্ট সুখলাভার্থ নিতান্ত আবশ্যক। যে বৃত্তি হৃদয়ে সঞ্চারিত হইলে পরের দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা হয়, উৎকৃষ্ট সুখ লাভার্থ সেই বৃত্তির বিকাশ প্রয়োজনীয়। সেই বৃত্তিকে দয়া বলে। তোমাদিগের দয়াবৃত্তি বিকাশেও যত্নবান্ হইতে হইবে।

যেমন আমরা সর্ব্বদা পরমেশ্বরের অসীম দয়া উপভোগ

করি, সেইরূপ আমাদিগের নিকটে যাহারা দয়াপ্রার্থী তাহা-দিগকেও আমাদিগেরও দয়া করা কর্ত্তব্য। মানুষ মানুষের প্রতি দয়াপরবশ না হইলে, অন্যের উপকার করিতে তাহার ইচ্ছা হয় না। মানুষ মানুষের উপকার সাধন না করিলে, প্রতিমনুষ্য প্রায় স্বতন্ত্র জীব হইয়া পড়ে—তাহাদের আর সমাজ-বন্ধন থাকে না; যাহার যাহা স্বার্থ সে তাহাই অন্বেষণ করিতে থাকে, অন্যের সুখদুঃখের প্রতি কেহই দৃষ্টি করিতে চাহে না। এরূপ হইলে পশুতে ও মানবে ব্যবহারগত কোন বিশেষ প্রভেদ থাকে না। এই দয়াই সমাজবন্ধনের মূল।

এই দয়া কেবল যে মনুষ্যেরই প্রতি প্রদর্শন করিতে হইবে, তাহা নহে। ইতর প্রাণিগণের প্রতিও দয়াশীল হওয়া কর্ত্তব্য। যিনি ইতর প্রাণিগণের প্রতি দয়া দেখাইতে শৈথিল্য করেন, তিনি মনুষ্যের প্রতিও তাদৃশ দয়াপ্রকাশে সমর্থ হন না। মানবের হউক, কি ইতর প্রাণীরই হউক, দুঃখ দেখিলেই তাহা মোচনের জন্য চেষ্টা করা উচিত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—মহতী কাহিনী।

সংসারে প্রকৃত সুখলাভ করিতে হইলে, যেরূপ শিক্ষার প্রয়োজন, আমি তাহার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তোমাদিগকে প্রদান করিয়াছি। এখন কয়েকটি মহতী কাহিনী তোমাদিগের নিকটে বর্ণনা করিব।

রামদুলাল।

কলিকাতার উত্তরে দমদমা বলিয়া একটি রেলওয়ে ষ্টেসন আছে, তাহা তোমরা অবগত আছ। ঐ ষ্টেসনের নিকটে রেকজানি নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। ঐ গ্রামে পূর্ব্বে রামদুলাল সরকার নামক এক ব্যক্তি বাস করিতেন। রাম-দুলাল দরিদ্র সন্তান। তাঁহার মাতামহী, মদনমোহন দত্ত নামক কলিকাতার অতি সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যক্তির গৃহে পাচিকার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। রামদুলাল বাল্যকালে এই মদনমোহন দত্তের বাড়ীতে মাতামহীর নিকটে থাকিয়া যৎসামান্য লেখা পড়া অভ্যাস করেন। তাঁহার দরিদ্রাবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া মদনমোহন ষোড়শবৎসর বয়সকালে তাঁহাকে আপনার বাটীতে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে সরকার নিযুক্ত করেন। রামদুলাল আপনার সচ্চরিত্র ও পরিশ্রম বলে এই সামান্য অবস্থা হইতে ক্রমে এক জন অদ্বিতীয় ধনী হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমি তাঁহার গুণ-রাশির দুই একটী পরিচয় তোমাদিগকে প্রদান করিতেছি।

রামদুলাল যে দরিদ্র ছিলেন, তাহা তোমাদিগকে বলিয়াছি। দরিদ্রের ধনলোভ-সংবরণ বড় সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। কিন্তু রামদুলাল দরিদ্রাবস্থায় থাকিয়াও কিরূপে এই লোভ সংবরণ করিতেন, তাহার একটী গল্প তোমাদিগকে বলিতেছি।

রামদুলাল যখন মদনমোহন দত্তের বাটীতে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন জাহাজের বাণিজ্যদ্রব্যাদি ক্রয় করা তাঁহার একটী প্রধান কার্য্য ছিল। রামদুলাল সময়ে সময়ে গঙ্গাতীরে যাইয়া জাহাজের দ্রব্যাদির অনুসন্ধান লইতেন।

একদিন তিনি ঐ কার্য্যে গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, একখানি জাহাজ ভাগীরথীর গর্ভে মগ্ন হইয়া আছে। রামদুলাল সাতিশয় বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। জাহাজের মূল্যাদি নির্দ্ধারণে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। তিনি মনে মনে ঐ জলমগ্ন জাহাজের দ্রব্যাদির একটা মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া লইলেন। কিছু দিন পরে রামদুলাল একদিন প্রভুর আজ্ঞায় কোন দ্রব্য নীলামে ক্রয় করিতে ভাগীরথীর তীরে আসিয়া দেখেন যে, পূর্ব্বোক্ত জলমগ্ন জাহাজখানি নীলামে ধরা হইয়াছে। ঐ জাহাজের কি মূল্য হইতে পারে, তাহা তাঁহার জানা ছিল। তিনি ইতস্ততঃ না করিয়া, দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য মদনমোহন তাঁহাকে যে চৌদ্দ হাজার টাকা দিয়াছিলেন, তদ্দ্বারাই সেই জাহাজ ক্রয় করিলেন। ক্ষণপরেই জাহাজের প্রকৃত মূল্য কাহারও অবিদিত রহিল না। তখন অনেকেই ঐ জাহাজ রামদুলালের হস্ত হইতে আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রামদুলাল ঠকিবার পাত্র নহেন—তিনি প্রথমে ঐ জাহাজ কাহাকেও ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন না। পরে, অনেক তর্কবিতর্ক, অনেক উপরোধ, অনেক পীড়াপীড়ির পরে, রামদুলাল প্রায় লক্ষ টাকা লাভ করিয়া ঐ জাহাজ অন্যের নিকট বিক্রয় করিলেন। ব্যাপারটী ভাবিয়া দেখ—দরিদ্র পাঁচ টাকা বেতনের রামদুলালের হঠাৎ লক্ষ টাকা হস্তগত হইবার সম্ভাবনা হইল; প্রভু যে চৌদ্দহাজার টাকা তাঁহাকে দিয়াছিলেন তাহার এক কপর্দ্দকও গ্রহণ না করিয়া রামদুলালের লক্ষ টাকা লাভ করিবার সুযোগ ঘটিল; কিন্তু রামদুলাল তাহা করিলেন

না। পাঁচ টাকা বেতনের চাকর হইয়াও, রামদুলাল সাধুতার বলে লক্ষ টাকা অনায়াসে তুচ্ছ মনে করিতে পারিলেন। তিনি মনে করিলেন "ঐ টাকা ন্যায়তঃ আমার প্রাপ্য নহে। আমি প্রভুর কার্য্যে এই স্থানে আসিয়াছি। প্রভুর টাকার দ্বারা এই টাকা আমি পাইতেছি—অতএব এ টাকা আমার নহে, ইহা প্রভুর টাকা। মূলধন যাঁহার, লাভও তাঁহার।" তিনি এই মনে করিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, মদনমোহনকে সবিশেষ নিবেদন করিয়া তাঁহাকে সেই লক্ষ টাকা প্রদান করিলেন।

ব্যাপার দেখিয়া মদনমোহন সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। ভৃত্য রামদুলালের এমন সাধুতা, এমন অসাধারণ লোভ সংবরণ দেখিয়া তিনি উদার চিত্তে ঐ সমস্ত টাকাই রামদুলালকে প্রত্যর্পণ করিলেন। যেমন ভৃত্য প্রভুর সহিত আচরণ করিল, প্রভুও সেইরূপ ভৃত্যের সহিত আচরণ করিলেন। উভয় দিকেই হৃদয়ের মহতী উদারতা প্রদর্শিত হইল। উভয়েই উভয়ের গুণে মুগ্ধ হইয়া অতুল আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

এখন ভাবিয়া দেখ, রামদুলাল যদি এই পন্থা অবলম্বন না করিতেন, তিনি যদি হৃদয়ের এইরূপ উদারতা ও সাধুতা প্রদর্শন না করিতেন, তবে কি তাঁহার ঐরূপ অতুল আনন্দ-লাভ ভাগ্যে ঘটিতে পারিত? রামদুলাল যদি গোপনে ঐ টাকা হস্তগত করিতেন, তাঁহার অর্থপ্রাপ্তি ঘটিত বটে, কিন্তু মনের সুখ ঘটিত না। তিনি ঐ টাকা হস্তগত করিতে চাহিলে, তাঁহাকে তজ্জন্য অবশ্যই প্রভুর নিকটে মিথ্যা কথা বলিতে হইত—তিনি যে প্রভুর অর্থ দ্বারাই জাহাজখানি কিনিয়াছিলেন, এ কথা তাঁহার

গোপন করিতে হইত। এই কথা যাহাতে প্রকাশ না পায়, তজ্জন্য তাঁহাকে সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিতে হইত। কিন্তু সম্ভবতঃ কালে একথা প্রকাশ হইয়া পড়িত। লোকসমাজে তাঁহার অত্যন্ত কলঙ্ক হইত—কেহ তাঁহাকে আর সেইরূপ বিশ্বাস করিত না। কত আর তোমাদিগকে দেখাইব—সাধুতার পথ লঙ্ঘন করিলে নিশ্চয়ই রামদুলালের আজীবন নানাপ্রকার কষ্ট পাইতে হইত। কিন্তু দরিদ্র রামদুলাল ধনের ঐরূপ লোভ সংবরণ করায় যেমন প্রভুর সন্তোষ, জনসমাজে কীর্ত্তি, তেমনই প্রভূত অর্থও লাভ করিয়া পরম সুখে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার যশের কথা এখনও আমরা অন্যের নিকট কীর্ত্তন করিয়া থাকি।

রামদুলালের বিনয়গুণও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রামদুলাল যদিও দরিদ্রসন্তান ছিলেন, তিনি নিজে প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরিশেষে একজন অদ্বিতীয় ধনী হইয়া উঠিয়াছিলেন। লোকপ্রবাদ আছে যে, নির্ধন ব্যক্তি ধনবান হইলে, জগৎকে তৃণবৎ জ্ঞান করে। স্থলবিশেষে এ কথা সত্য বলিয়াও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু রামদুলাল এই লোকপ্রবাদের বিষয়ীভূত হয়েন নাই। তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য থাকাতেও, তিনি অদ্বিতীয় বিনয়ী ছিলেন। সেই বিনয়ের দুই একটি দৃষ্টান্ত তোমাদিগকে প্রদর্শন করিতেছি।

একদা কোন কারণ বশতঃ কোন এক ব্যক্তির সহিত তাঁহার পুত্রের কলহ উপস্থিত হয়। পুত্র ধনি-সন্তান—ক্রোধভরে সেই ব্যক্তিকে যৎপরোনাস্তি কটু বাক্য প্রয়োগ

করিতে ত্রুটি করিল না—কিন্তু রামদুলাল ইহা জানিয়া, সাতিশয় নম্রভাবে সেই ব্যক্তির নিকটে উপস্থিত হইয়া, যথার্থই কৃতাঞ্জলিপুটে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তিনি ধনের গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া পুত্রের পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক সে ব্যক্তিকে অপদস্থ করিবার প্রয়াস পাইলেন না—প্রত্যুত সাতিশয় বিনীতভাবে সেই ব্যক্তির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বিবাদও সহজে মিটিয়া গেল।

তোমাদিগের নিকট বলিয়াছি, মনদমোহন দত্তই রামদুলালকে প্রথমে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। মদনমোহন দত্তের নিকটে যখন রামদুলাল পাঁচ টাকা বেতনে কার্য্য করিতেন, তখনই তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইয়াছিল। রামদুলাল এই প্রভুর নিকট আজীবন পরম কৃতজ্ঞ ছিলেন। তিনি এই প্রভুকে চিরদিনই প্রভুর ন্যায় দেখিতেন। অদ্বিতীয় ধনশালী হইয়াও রামদুলাল একদিনের জন্যও এ সম্বন্ধ বিস্মৃত হয়েন নাই। এই প্রভুর বাটীতে তিনি যখন গমন করিতেন, পাদুকা বহির্ভাগে রাখিয়া বাটীতে প্রবেশ করিতেন। পূর্ব্বে যখন তিনি দরিদ্র, পাঁচ টাকা বেতনের সরকার ছিলেন, তখন প্রভুর বাটীতে সকলের সহিত যে ব্যবহার করিতেন, পরে অতুল ঐশ্বর্য্যাধিপতি হইয়াও তিনি সে ব্যবহার পরিবর্ত্তন করেন নাই। প্রভু মদনমোহন দত্তের নিকটে তিনি প্রতি মাসে পাঁচ টাকা বেতন লইতে বিস্মৃত হইতেন না। তিনি যে টাকার লোভে এরূপ বেতন গ্রহণ করিতেন, তাহা নহে। তখন তাঁহার অভাব ছিল না। তিনি যে তখনও সেই প্রভুর ভৃত্যই আছেন, এই ধারণা

প্রভুকে ও অন্যান্য সকলকে জানাইবার জন্য তিনি এইরূপ কার্য্য করিতেন। এ বড় সহজ গুণ নয়। রামদুলালের ন্যায় ধনবান হইলে, পূর্ব্বের প্রভুর সহিত সম্বন্ধ গোপন করিতেই অনেকের চেষ্টা হওয়া সম্ভবপর। আমরা অনেক স্থলেই দেখি যে, দরিদ্র-সন্তান বড় মানুষ হইলে, সে পূর্ব্বাবস্থা গোপন করিতেই সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকে, কিন্তু রামদুলাল সেই অবস্থা গোপন করা দূরে থাকুক, যাহাতে তাহা অধিকতররূপে প্রকাশ পায়, তজ্জন্য প্রভু মদনমোহন দত্তের নিকটে পাঁচ টাকা বেতন গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

বৎসগণ! এখন তোমরা ভাবিয়া দেখ, রামদুলালের এই বিনয়ে তাঁহার কিরূপ ক্ষতিবৃদ্ধি হইয়াছিল। রামদুলাল যদি বিনয় প্রকাশ না করিয়া গর্ব্ব ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতেন—যদি তিনি পূর্ব্ব প্রভুর সহিত সম্বন্ধ একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে প্রভুর ন্যায় সম্মান করিতে ত্রুটি করিতেন, তবে তাঁহার কি লাভ হইত? তাহাতে তাঁহার ধনও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত না, যশও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত না; সামান্য একটু আত্মাভিমান-জনিত সুখ হইতে পারিত। কিন্তু তাহা হইলে লোকে তাঁহার কলঙ্ক রটনা করিতে ত্রুটি করিত না। লোকসমাজে তিনি অকৃতজ্ঞ ও অবিনয়ী বলিয়া ঘোষিত হইতেন। স্থল বিশেষে লোকে তাঁহার সম্মুখেই তাঁহাকে দরিদ্র সন্তান বলিয়া উপহাস করিতে বিমুখ হইত না। তাঁহার পূর্ব্ব অবস্থার দুই একটি কাহিনীও বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে সমাজে লজ্জিত করিতে ছাড়িত না। সুতরাং যে আত্মাভিমান জন্য তাঁহার কিঞ্চিৎ সুখ

হইত, সেই আত্মাভিমান জন্যই তাঁহার কষ্টের পরিসীমা থাকিত না। তিনি যে আত্মাভিমানজনিত আপাতসুখ ত্যাগ করিয়া লোকসমাজে সর্ব্বদা বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করিতেন, তাহাতে যেমন তাঁহার সদ্‌গুণ তেমনই তাঁহার বুদ্ধিও প্রকাশ পাইয়াছিল। সেই সদ্‌গুণ ও বুদ্ধিবলে তিনি যেমন অর্থ, যশ, তেমনই প্রচুর আনন্দও উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই যে লোকটীর সঙ্গে তাঁহার পুত্রের বিবাদ হইয়াছিল, যদি তিনি সেই লোকটীকে কোন প্রকারে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে সে লোকটী তাঁহার অনিষ্টের ও অখ্যাতি রটনার চেষ্টা করিত। তিনি সামান্য বিনয় প্রকাশ করায়, সে তাঁহার শত্রু না হইয়া বোধ হয় আজীবন তাঁহার গুণের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া রহিল।

রাণা রায়মল্ল।

মিবারের অধিপতি মহারাণা রায়মল্লের জয়মল্ল নামক এক পুত্র ছিল। জয়মল্ল একদা শুনিতে পাইলেন, টোডা নামক জনপদের পূর্ব্বাধিপতি সুরতন রাও এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, যিনি লিল্লা নামক পাঠানের হস্ত হইতে টোডা উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন, তাঁহাকে তিনি তদীয় তারাবাই নাম্নী কন্যা সমর্পণ করিবেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া জয়মল্ল তারাবাইর পরিণয় প্রার্থী হইয়া টোডা আক্রমণ করিতে যাত্রা করিলেন। এই উপলক্ষে লিল্লার সহিত তাঁহার ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। যুদ্ধে জয়মল্ল অসীম বলবীর্য্য প্রদর্শন করিলেও জয়লাভ

করিতে পারিলেন না। সুতরাং ন্যায়তঃ তারাবাইর পাণিগ্রহণে তাঁহার আর কোন দাবি রহিল না। কিন্তু জয়মল্ল মহারাণার পুত্র—সুরতন সেই মহারাণারই অধীন ব্যক্তি, এই মনে করিয়া জয়মল্ল বলপূর্ব্বক তারাবাইকে বিবাহ করিতে চেষ্টা করিলেন। এইরূপে সম্মান নষ্ট হইবার উপক্রম হওয়াতে, সুরতন অত্যন্ত ক্রোধবশে জয়মল্লকে অসির আঘাতে নিহত করিলেন।

এই গুরুতর সংবাদ অচিরে মিবারের মহারাণার নিকটে উপস্থিত হইল। সংবাদ শুনিয়া মিবারের সমস্ত লোক বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল। তাহারা মনে করিত লাগিল, মহারাণা রায়-মল্ল না জানি পুত্রশোকে অধীর হইয়া কি ভীষণ প্রতিহিংসারই বিধান করেন। মিবারের মহারাণা কটাক্ষ করিলে, মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই সুরতনের দেহশূন্য মস্তক তৎসমীপে আনীত হইতে পারিত। কিন্তু মহানুভব মহারাজ রায়মল্ল এমনই ন্যায়পর নরপতি ছিলেন যে, তিনি এ সম্বন্ধে সুরতনকে কিছুমাত্র দোষী বিবেচনা করিলেন না। তিনি দেখিলেন যে, জয়মল্ল সুরতনের যেরূপ অপমান করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সেইরূপ অপমান রাজপুতের দুঃসহনীয়। এই মনে করিয়া তিনি পুত্রশোকও বিস্মৃত হইয়া ন্যায়পরতাবশে সুরতনের প্রতি কিছুমাত্র রোষ প্রকাশ করিলেন না। প্রত্যুত তিনি বলিলেন—'জয়মল্ল কুলাঙ্গার, তাহাকে বধ করিয়া সুরতন ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্যই সম্পন্ন করিয়াছেন।' শুদ্ধ এই কথা বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি সুরতনকে এই ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্যের জন্য পুরস্কার স্বরূপ বেদনোর রাজ্য প্রদান করিলেন।

একবার ভাবিয়া দেখ, এই কার্য্যে কত বড় মহানুভাবতা ও ন্যায়পরতা প্রকাশিত হইল। পুত্র অন্য কর্ত্তৃক ন্যায়তঃ তিরস্কৃত হইলেও, সাধারণ লোকে সেই তিরস্কারকারীর বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া থাকে। কিন্তু প্রবলপ্রতাপান্বিত মহারাণা রায়মল্ল প্রতিবিধানের ক্ষমতা সত্ত্বেও, পুত্রহত্যাকারী সুরতন রাওকে কিছুমাত্র দণ্ড প্রদান করিলেন না। তিনি দুর্জ্জয় পুত্রশোক প্রাপ্ত হইয়াও, ন্যায়পরতার বিধান কণামাত্র বিস্মৃত হইলেন না। তিনি বিচার করিয়া দেখিলেন—পুত্র অপরাধী—এমন অপরাধী যে সুরতন রাও তাহাকে বধ করিয়া কোন অন্যায্য কার্য্য করেন নাই। এইরূপ বিচার করিয়া মহারাজ সুরতন রাওর প্রতি ক্রোধ সংবরণ করিলেন এবং সেই ক্রোধ সংবরণের চিহ্ন স্বরূপ তাঁহাকে প্রকাশ্যভাবে রাজদত্ত পুরস্কারে ভূষিত করিলেন।

এইরূপ কার্য্যে যে মহারাজ কি পরিমাণে বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনীয় নহে। পুত্রশোকে অধীর হইয়া সুরতন রাওকে বধ করিলে, তাঁহার কিছু মাত্র ফল হইত না। জিঘাংসা চরিতার্থতা জন্য ক্ষণকালের তরে তাঁহার এক প্রকার সুখ জন্মিলেও, অল্প সময় পরেই তাঁহার নানাপ্রকার কষ্ট উপস্থিত হইত। তিনি অন্যায়রূপে যে সুরতন রাওকে বধ করিয়াছেন, এ কথা তাঁহার মনে অবশ্যই উদিত হইত এবং এইজন্য তাঁহার মানসিক অশান্তিরও অবধি থাকিত না। আবার এ দিকে সুরতন রাওর সন্তান ও তাঁহার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব ও প্রজাগণও এই কার্য্যের জন্য নিতান্ত অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত থাকিত। তাঁহার নিজরাজ্যস্থ ন্যায়পর ব্যক্তিগণও এই

জন্য অসন্তুষ্ট থাকিত সন্দেহ নাই। এ সকল অসন্তোষে তাঁহার অনিষ্ট ঘটিবারও সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু মহারাণা এমনই ন্যায়-পরতা প্রদর্শন করিলেন যে, রাজ্যস্থ শত্রু পর্য্যন্ত তাহা দেখিয়া তদীয় গুণের একান্ত বশীভূত হইয়া পড়িল। জগতে তাঁহার অনন্তকালব্যাপী যশও বিদ্যমান রহিল। তিনি যাবজ্জীবন এই ন্যায়পরতার উৎকৃষ্ট ফল প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে ভোগ করিতে লাগিলেন।

রণজিৎসিংহ।

পঞ্জাব প্রদেশে শিখ নামক এক জাতি আছে। বীরত্বে এই জাতি ইতিহাসে সাতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই জাতিমধ্যে অকালী নামে এক বীরসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। যখন মহারাজ রণজিৎ সিংহ পঞ্জাবের অধিপতি ছিলেন, তখন ফুলাসিংহ নামক এক ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। ফুলাসিংহ এই অকালী সম্প্রদায়ের নেতা হইয়া নানাস্থানে নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে লাগিলেন। যখন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল লর্ড মিণ্টো রণজিৎ সিংহের সহিত সন্ধিস্থাপনের জন্য পঞ্জাবে দূত প্রেরণ করেন, তখন এই ফুলাসিংহ অমিত-পরাক্রমে দস্যুর ন্যায় এই ইংরেজ দূতের শিবির আক্রমণ করেন। আত্মরক্ষণে তৎপর ইংরেজ বীর অনায়াসে ফুলাসিংহকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া দিলেন। কিন্তু ইহাতে ফুলাসিংহের সাতিশয় ক্রোধ জন্মিল। তিনি সেই দুর্জ্জয় ক্রোধবশে নিষ্কাশিত তরবারি হস্তে মহারাজ রণজিৎ সিংহের নিকটে উপস্থিত হই-

লেন। তাঁহার নির্ভয় ব্যবহার ও প্রচণ্ড মূর্ত্তি দেখিয়া বীরকেশরী রণজিৎ সিংহ একান্ত বিস্মিত হইলেন। ফুলাসিংহ রণজিৎ সিংহের নিকটে গমন করিয়া অসি আস্ফালন পূর্ব্বক উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, "মহারাজ আপনি যে ইংরাজের সহিত সন্ধিবন্ধনে প্রস্তুত হইয়াছেন, সেই ইংরেজ আজ আমাদিগের দুর্দ্দশার একশেষ কবিয়াছে। তাহারা আমার এই দুর্জ্জয় অকালী সম্প্রদায়কে পরাজিত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে এবং আমাদিগের যারপর নাই দুরবস্থা করিয়াছে। আপনি নরপতি— আপনার নিকট এই আবেদন করিতেছি, আপনি সত্বর আমাদিগের এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। যদি তাহা না করেন, তবে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এই অসির ভীষণ আঘাতে আপনার বংশধরগণের এখনই প্রাণবিনাশ করিব।" এই কথা বলিয়া পরাজিত ফুলাসিংহ ক্রোধবশে হস্তস্থিত তরবারি আস্ফালন করিতে লাগিলেন। ফুলাসিংহ রণজিৎ সিংহের অধীন একজন সামান্য ব্যক্তি—তিনি রণজিৎ সিংহের সম্মুখে যেরূপ অবিনয় ও অসম্মান প্রদর্শন করিলেন, তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ দ্বিখণ্ডিত করিলেও, মহারাজকে কেহ কোন কথা বলিতে পারিত না। কিন্তু পৃথিবীর ন্যায় ধীর রাজাধিরাজ রণজিৎসিংহ ফুলাসিংহের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া, কিছুমাত্র ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। তিনি অবিচলিতচিত্তে, গম্ভীরভাবে ফুলাসিংহকে বলিলেন—"যুবক তোমার সাহসের আমি প্রশংসা করি, কিন্তু একথা নিশ্চয় জানিও, রণজিৎ সিংহ জীবিত থাকিতে ইংরাজদূতের কেশাগ্রও কেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না। আমি ইংরা-

জের সহিত বন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ; আমাকর্ত্তৃক ইংরাজদূতের অনিষ্টসাধন ন্যায় ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ। আমি কদাপি তাহা পারিব না। আমি আমার মস্তক তোমার সম্মুখে স্থাপন করিতেছি, তুমি বরং এই মস্তকোপরি তরবারির আঘাত করিয়া তোমার ক্রোধাগ্নির নির্ব্বাণ কর।” ফুলাসিংহ মহারাজ রণজিৎসিংহের এইরূপ দৃঢ়তা, গম্ভীরতা, ন্যায়পরতা ও অকুতোভয়তা নিরীক্ষণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক হস্তস্থিত তরবারি দূরে নিক্ষেপ করিয়া রাজার পদপ্রান্তে পতিত হইলেন। মহারাজ স্বহস্তে ফুলাসিংহকে উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার অনুচরবর্গকে বিশেষ পারিতোষিক প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন।

এখন তোমরা ভাবিয়া দেখ, মহারাজ রণজিৎ সিংহ কি প্রকার ন্যায়পর ও সংযমী ছিলেন। তাঁহার ক্রোধ হইলে, ফুলাসিংহের এক খণ্ড অস্থিও অভগ্ন থাকিত না—ফুলাসিংহের অনুচরবর্গের এক জনও জীবিত থাকিত না। কিন্তু মহারাজ সংযমবলে ক্রোধবৃত্তিকে তাঁহার হৃদয় বিক্ষোভিত করিতে দিলেন না। তিনি ফুলাসিংহের ঐরূপ দুর্ব্বিনীত ব্যবহার-মধ্যেও তাঁহার সাহস প্রত্যক্ষ করিয়া প্রীতিলাভ করিলেন, এবং তাঁহাকে পারিতোষিক প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন। মহারাজের এই কার্য্যে যে কি ফল হইল, তাহাই তোমাদিগকে এখন বলিতেছি। মহারাজের ব্যবহার দেখিয়া ফুলাসিংহ আজীবন তাঁহার পরম অনুগত এবং তাঁহার উপকারসাধনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া রহিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে যে ঔদ্ধত্য প্রভৃতি নানা-

প্রকার চরিত্রের দোষ ছিল, মহারাজের ব্যবহার দেখিয়া ক্রমশঃ তাহা কমিয়া যাইতে লাগিল। কালে তিনি মহারাজের একজন অতি বিশ্বস্ত প্রধান সেনাপতি হইয়া দাঁড়াইলেন। এই সেনাপতির সাহায্যে রণজিৎ সিংহ কয়েকটী ভয়ঙ্কর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন।

দেখ, মহারাজের এক দিনের ব্যবহারে কি সুফল ফলিয়াছিল। তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া ফুলাসিংহের ন্যায় দুর্ব্বিনীত লোকও বিনয়ী ও অনুগত হইয়া চিরদিন তাঁহার হিতসাধনে তৎপর রহিল। মহারাজ প্রায় সেই ব্যবহারফলেই পেশাবর নামক স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন; কারণ ফুলাসিংহ তাঁহার জন্য আত্মবিসর্জ্জন না করিলে, সে যুদ্ধে তাঁহার জয়ের সম্ভাবনা ছিল না।

শিবাজী।

তোমরা ইতিহাসে মহারাষ্ট্রাধিপতি শিবাজীর কাহিনী পাঠ করিয়া থাকিবে—যদি না পড়িয়া থাক, ভারতের ইতিহাস পাঠসময়ে তাহা পড়িবে। এই শিবাজী একজন অসাধারণ মানব ছিলেন; ইঁহার মত বলিষ্ঠ, কর্ম্মিষ্ঠ, দেশভক্ত, পিতৃভক্ত ও মাতৃভক্ত লোক সচরাচর দেখা যায় না। এই শিবাজীর জীবনবৃত্তান্ত হইতে তাঁহার একটি রমণীয় গুণকাহিনী আজি তোমাদের নিকটে বর্ণনা করিব।

রামদাস স্বামী মহারাষ্ট্রাধিপতি শিবাজীর গুরু ছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, এই রামদাস স্বামীর

প্রতি মহারাষ্ট্রাধিপতির ভক্তির একটী অপূর্ব্ব কাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, এক সময়ে রামদাস স্বামী আপন মনে ভ্রমণ করিতে করিতে সাতারা নামক নগরে উপনীত হন। মহারাষ্ট্রাধিপতি শিবাজীও সেই সময়ে উক্ত নগরে উপস্থিত ছিলেন। রামদাস স্বামী রাজার গুরু হইলেও ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লজ্জা বোধ করিতেন না। সেই ভিক্ষার জন্য রামদাস স্বামী এক গৃহস্থের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া, "জয় রঘুপতি" বলিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। মহারাষ্ট্রাধিপতি শিবাজী নিকটবর্ত্তী এক গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই স্বর শুনিয়া শিবাজী রামদাস স্বামীকে চিনিতে পারিলেন। মহারাষ্ট্রাধিপতি তৎক্ষণাৎ নিকটস্থ কর্ম্মচারীকে কি লিখিতে আদেশ দিয়া, দ্রুতপদে গুরু রামদাস স্বামীর পদপ্রান্তে পতিত হইলেন এবং তাঁহাকে সযত্নে নিজ গৃহে আনয়ন করতঃ পূর্ব্বে কর্ম্মচারীকে যে লিপি লিখিতে আদেশ করিয়াছিলেন, সেই লিপি স্বামীজীর ভিক্ষাপাত্রে অর্পণ করিলেন। স্বামীজী শিবাজীকে চিনিতেন; তিনি তাঁহাকে বলিলেন "শিব্বা, তুমি এ কি কাগজ ভিক্ষাপাত্রে নিক্ষেপ করিলে? কাগজ দ্বারা আমরা উদর পূর্ণ করি না, মুষ্টিমিত অন্ন হইলে আমাদিগের শরীরচিন্তা দূর হয়।" ইহা বলিয়া স্বামীজী পার্শ্ববর্ত্তী একটী লোককে ঐ লিপি পাঠ করিতে বলিলেন। যখন সেই লিপিপাঠ হইল, তখন সকলেই বিস্মিত হইয়া শ্রবণ করিল, শিবাজী ঐ লিপি দ্বারা তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব গুরুচরণে অর্পণ করিয়াছেন। পুরাণে যেমন হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যানে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রকে যথা-

সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন, শিবাজীও তেমনই গুরুচরণে যথা-সর্ব্বস্ব দান করিলেন। তখন রামদাস স্বামী হাসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা শিবব।, তুমি যথাসর্ব্বস্ব আমাকে দিয়াছ, এখন তুমি কি করিবে ?" শিবাজী তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "ভগবন্ ! আপনার শত শত শিষ্য আছে, আমি তাঁহাদিগের অধীন হইয়া আপনার চরণ সেবা করিব।" স্বামী কহিলেন, "ইহাতে কৌপীন ধারণ করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হয়। এ সকল কঠোর ব্রত তুমি কি পালন করিতে পারিবে ?" শিবাজী প্রত্যুত্তরে কহিলেন "দাস শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে সকল বিষয়েই প্রস্তুত আছে। স্বামীজী শিষ্যের ভক্তি দেখিয়া পরম পুলকিত হইলেন এবং তিনি শিবাজীকে নানাপ্রকার ধর্ম্মনীতি সহকারে বুঝাইয়া বলিলেন, শিবাজীর রাজকার্য্যই পরম ধর্ম্ম। গুরুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া শিবাজী কহিলেন—"গুরুদেব, যাহা একবার আপনার চরণে সমর্পণ করিয়াছি, তাহা কিরূপে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিব ? আমরা ক্ষত্রিয়, প্রতিগ্রহ আমাদিগের ধর্ম্ম নহে।" তখন স্বামীজী শিবাজীকে তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ রাজকার্য্য করিতে অনুমতি করিলেন; শিবাজী অগত্যা তাহাতে সম্মত হইয়া রাজকার্য্য করিতে স্বীকার করেন। এই সময় হইতেই রামদাস স্বামীর গৈরিক বসন মহারাষ্ট্রীয়দিগের জাতীয় পতাকার স্থান অধিকার করিয়াছিল।

এই কাহিনী এমনই অদ্ভুত যে, ইহা কাল্পনিক বলিয়াই বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু ইহা ঐতিহাসিক সত্য কথা। রামদাস স্বামী শিবাজীর দীক্ষাগুরু ছিলেন এবং তিনি সর্ব্বদা

তাঁহাকে জীবনের কর্ত্তব্যপথ বুঝাইয়া দিতেন। হিন্দুজাতি ভিন্ন অন্য কোন জাতি দীক্ষাগুরুকে ভক্তি করা বিশেষ গুণ বলিয়া স্বীকার না করিতে পারেন, কিন্তু সকলেই একবাক্যে এই প্রকার আত্মবিসর্জ্জনের সুখ্যাতি করিবেন সন্দেহ নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

অদ্য তোমাদিগের সমীপে আমাদের বঙ্গদেশস্থ এক মহানুভব ব্যক্তির মহতী কাহিনী বর্ণনা করিব। তিনি রাজা ছিলেন না সত্য, কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোকের হৃদয়ে তাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহার নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগরের নাম তোমরা অবশ্যই শুনিয়াছ। অদ্য আমি তাঁহারই কয়েকটি গুণের কথা তোমাদিগকে শুনাইতে ইচ্ছা করিয়াছি।

কলিকাতার সন্নিকটস্থ কোন পল্লিতে এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের গৃহে, তাহার ভাগিনেয়ের ওলাউঠা রোগ হয়। ওলাউঠা রোগের কথা জানিতে পারিয়া গৃহস্বামী মৃত্যুভয়ে আপনার কর্ত্তব্যবুদ্ধি বিস্মৃত হইয়া ভাগিনেয়কে বাটীর বাহিরে সামান্য এক স্থানে শোয়াইয়া রাখিলেন। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় লোকমুখে এই সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা সুপ্রসিদ্ধ বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া সেই ভদ্রলোকের গৃহে উপনীত হইলেন। তাঁহারা সেখানে গিয়া দেখিলেন, রোগীকে বাটীর বাহিরে এক কদর্য্য স্থলে মাদুরের উপরে শোয়াইয়া

রাখা হইয়াছে। দেখিয়া দয়ার সাগরের হৃদয়ে দয়া উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি অনতিবিলম্বে স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্নকে বাজারে পাঠাইয়া দিলেন। দীনবন্ধু রাত্রিতেই বহুবাজার হইতে বালিস তোষক প্রভৃতি স্বীয় মস্তকে বহন করিয়া দেড় ক্রোশ পথ দূর সেই বাটীতে উপস্থিত হইলেন। দয়ার সাগর নিজে রোগীর শুশ্রূষা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, নিজ হস্তে রোগীর মলমূত্রাদি পরিষ্কার করিয়া দিলেন। যে পর্য্যন্ত রোগী আরোগ্যলাভ না করিল সে পর্য্যন্ত বিদ্যাসাগর সেই বাটী হইতে অন্যত্র গমন করিলেন না।

এই সময়ে বড়বাজার কোন এক মোক্তারের বাটীতে তাঁহার ভৃত্যের ওলাউঠা হয়। মোক্তার বাবু সংবাদ জানিবামাত্র চাকরের হাত ধরিয়া উপর হইতে নামাইয়া রাস্তায় শোয়াইয়া রাখিলেন। ঘটনাক্রমে বিদ্যাসাগর ঐ রোগীকে দেখিতে পান। দেখিবামাত্র দয়ার সাগর তাহাকে নিজের বাটীতে লইয়া আসিলেন এবং নিজের বাটীতে আনিয়া নিজের শয্যায় তাহাকে শোয়াইয়া চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাম তোমরা শুনিয়া থাকিবে। এক সময়ে এই কবি বিলাত হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে টাকার জন্য বিনীতভাবে এক পত্র লিখেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তখন হাতে টাকা ছিল না, কিন্তু তিনি ঋণ করিয়াও চারি সহস্র টাকা মধুসূদন দত্তকে পাঠাইয়া দিলেন।

এই সকল দয়ার কাহিনী হইতে তোমরা দেখিতে পাইতেছ, বিদ্যাসাগর মহাশয় এমন দয়াশীল ছিলেন যে, দয়াবৃত্তি প্রণো-

দিত হইলে, তিনি কি ধন, কি প্রাণ কিছুরই দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন না। দয়াবলে তিনি মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করিতে পারিতেন—দয়াবশে তিনি সংসারের সর্ব্বপ্রধান কষ্ট দারিদ্র্য-ভয়, ঋণভয়ও অবহেলা করিতে পারিতেন। যিনি প্রকৃত দয়াশীল, তাঁহার দয়া,বিচার করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় না।

বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবলমাত্র যে মনুষ্যের প্রতিই দয়া-শীল ছিলেন, এমন নহে। তাঁহার দয়া পশ্বাদির প্রতিও সঞ্চা-রিত হইত। ইহার একটা সুন্দর গল্প তাঁহার জীবনচরিতে পাঠ করিয়াছি। তিনি এক দিন দেখিতে পাইলেন, এক স্থানে গো-দোহন কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। একজন লোক গোবৎস ধরিয়া আছে অন্য একটি লোকে দুগ্ধ দোহন করিতেছে। গোবৎস দূরে থাকিয়া তাহার মাতৃস্তন্য নিঃসৃত হইতেছে দেখিয়া, পান করিবার জন্য সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছে ও উচ্চৈঃস্বরে হাম্বারব করিয়া, সেই দিকে ছুটিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। দেখিয়া বিদ্যাসাগরের দয়ার সাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল—দর দর ধারে নয়ন হইতে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই ঘটনার পরে কিছুকাল গোদুগ্ধ এবং তদ্দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যাদির ভোজন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি এই দয়া-পরতন্ত্র হইয়া একবার মৎস্যাহারও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর স্বদেশস্থ পাঠশালায় পাঠ শেষ করিয়া অষ্টম বর্ষ বয়সে কলিকাতা মহানগরীতে বিদ্যাভ্যাস জন্য উপস্থিত হন। বিদ্যাসাগরের পিতা সাতিশয় দরিদ্র ছিলেন। তিনি বড়বাজারে জগদ্দুর্লভ সিংহ নামক কোন এক ব্যক্তির বাসায়

বিদ্যাসাগরের সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ বাসার নিকটে এক পাঠশালা ছিল—বিদ্যাসাগর প্রথমে তাহাতেই বিদ্যাভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু কিছুদিন পরেই অষ্টম বর্ষীয় বালক বিদ্যাসাগর তাঁহার পিতার নিকটে আসিয়া নিবেদন করিলেন—"মহাশয়, আমি দেশস্থ পাঠশালায় যাহা শিখিয়া আসিয়াছি, এখানে তাহার অপেক্ষা কিছুই অধিক শিক্ষা হয় না। প্রত্যহ অনর্থক তথায় যাইয়া সময় অতিবাহিত করিতে হয়। অতএব যাঁহার নিকট নূতন বিষয় শিখিতে পারি, আমাকে সেইরূপ গুরুমহাশয়ের নিকটে নিযুক্ত করুন, নচেৎ বিদেশে থাকিবার আবশ্যকতা কি?" কিছু কাল পরে, বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হন। বিদ্যাসাগরের জীবনচরিতে লিখিত আছে, এই সময়ে যখন বিদ্যাসাগর স্বীয় মস্তকোপরি ছত্র ধারণ করিয়া বড়বাজার হইতে পটলডাঙ্গা সংস্কৃত কলেজে পড়িতে আসিতেন, তখন বোধ হইত যেন একটী ছত্র সজীব হইয়া পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে দিনের বেলা যাহা পড়িয়া আসিতেন, রাত্রিতে তাহা তাঁহার পিতার নিকটে বলিতে হইত। বিদ্যাসাগর এমনই ভাবে তাঁহার পিতার নিকটে পাঠ বলিতেন যে, বিদ্যাসাগরের পিতা সে সকল বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইয়াও, অনায়াসে তাহা বুঝিতে পারিতেন। কথিত আছে, এইরূপে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা এমন ব্যাকরণ শিখিয়াছিলেন যে বিদ্যাসাগর মনে করিতেন, তাঁহার পিতার ব্যাকরণে ভাল অধিকার আছে। বস্তুতঃ সংস্কৃত ব্যাকরণ তিনি ইতিপূর্ব্বে কিছুমাত্র অবগত ছিলেন

না। বিদ্যাসাগর বাসায় অনেক সময়েই একাকী থাকিয়া পাঠাভ্যাস করিতেন—কারণ তাঁহার পিতা কর্ম্মস্থান হইতে রাত্রি নয়টার পর বাসায় আসিতেন। তিনি বাসায় আসিয়া যদি দেখিতেন যে, বিদ্যাসাগর ঘুমাইয়া রহিয়াছেন, অমনি তিনি তাঁহাকে গুরুতর প্রহার করিতেন। একারণ বিদ্যাসাগর রাত্রিতে প্রদীপের সর্ষপ তৈল চক্ষে লাগাইয়া জাগরিত থাকিতেন। তৈল চক্ষে লাগিলে, চক্ষু জ্বালা করিত, সুতরাং বিদ্যাসাগরের সহজে নিদ্রাকর্ষণ হইত না। এই শেষ রাত্রিতেও তিনি পিতার নিকটে নানাপ্রকার কবিতা অভ্যাস করিতেন।

বিদ্যাসাগর যখন যে শ্রেণীতে পড়িতেন, তখন সেই শ্রেণীতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইতে তাঁহার বিলক্ষণ জেদ ছিল। এজন্য প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া পাঠাভ্যাস করিতে তিনি ত্রুটি করেন নাই। তিনি প্রায়ই তাঁহার পিতাকে বলিতেন আমি রাত্রি দশটার সময়ে আহার করিয়া শয়ন করিব, রাত্রি বারটা বাজিলে আপনি আমাকে জাগরিত করিবেন। এইরূপে দুই ঘণ্টা মাত্র নিদ্রিত থাকিয়া বিদ্যাসাগর অবশিষ্ট সমস্ত রাত্রি বিদ্যাভ্যাস করিতেন। এইরূপ অধ্যবসায় ও পরিশ্রমবলে বিদ্যাসাগর বিশেষ প্রশংসার সহিত সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন।

এই পাঠাভ্যাস কালেই কয়েকদিন বিদ্যাসাগরকে স্বহস্তে পাকাদি করিতে হইত। তিনি এই সময়ে প্রত্যূষে কিছুকাল পুস্তকাদি পাঠ করিয়া গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে যাইতেন। স্নান করিয়া বাসাতে প্রত্যাগমনের সময় বাজার হইতে মৎস্যাদি

রন্ধনদ্রব্য সমস্ত ক্রয় করিয়া লইয়া আসিতেন। বাসায় পৌঁছিয়া, প্রথমতঃ ভোজনদ্রব্য সকল রন্ধনোপযোগী করিয়া সংগ্রহ করিতেন। হরিদ্রা মরিচ প্রভৃতি ঝাল মসলা বাটিয়া পরে উনন ধরাইয়া পাকক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন। আহারান্তে তাঁহাকেই উচ্ছিষ্ট মুক্ত ও ভোজন-পাত্র মার্জ্জনা ও ধৌতাদি করিতে হইত। এইরূপ কার্য্যে তাঁহার অঙ্গুলির ও নখের অগ্রভাগ প্রায় ক্ষয় পাইয়া যাইত। এইরূপ করিয়াও তিনি বিদ্যাভ্যাসে কিছুমাত্র ঔদাস্য প্রকাশ করেন নাই। বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে এইরূপ চেষ্টা ও একাগ্রতানিবন্ধন বিদ্যাসাগর অতি অল্প বয়সেই সংস্কৃত শাস্ত্রে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

সংস্কৃত কলেজে পাঠ সমাপন করিয়া বিদ্যাসাগর যখন ফোর্টউইলিয়ম কলেজে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে পণ্ডিত নিযুক্ত হন, তখন তাঁহার ইংরাজী ও হিন্দুস্থানী ভাষা শিখিবার আবশ্যকতা হয়। এই জন্য তিনি মাসিক দশ টাকা বেতন দিয়া এক জন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহার নিকটে প্রাতে ৯টা পর্য্যন্ত হিন্দীভাষা শিখিতে লাগিলেন। ইংরাজী ভাষা শিখিবার জন্য বিদ্যাসাগর তাঁহার পরম বন্ধু বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। দুর্গাচরণ বাবু প্রথমে নিজেই বিদ্যাসাগরকে ইংরাজী শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে দুর্গাচরণ বাবুর একজন ছাত্র নীলমাধব মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ইংরাজী শিখাইবার ভার গ্রহণ করিলেন। ইহার পরে বিদ্যাসাগর মাসিক নয় টাকা বেতন দিয়া মাষ্টার রাখিয়া, ইংরাজী ভাষা অভ্যাস করিতে লাগিলেন।

এইরূপ বাল্যকাল বিগত হইলেও, বিদ্যাসাগর অসাধারণ চেষ্টা ও উদ্যম সহকারে অল্পকালের মধ্যেই ইংরাজী ভাষাতেও ব্যুৎপন্ন হইলেন। তিনি এইরূপে এমন ইংরাজী লিখিতে শিখিয়াছিলেন যে, তৎকালে ইারাজীভাষায় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণও তাঁহার ইংরাজী লেখা দেখিয়া বিশেষ প্রশংসা করিতেন।

তোমরা কেহ কেহ মনে করিতে পার, দরিদ্র হইলে বুঝি ব্যয়সাধ্য ইংরাজী ভাষা শিখিয়া বড়লোক হইবার উপায় নাই। কিন্তু দেখ, এই বিদ্যাসাগর দরিদ্র সন্তান হইয়াও কেমন চেষ্টা ও অধ্যবসায় বলে লেখাপড়া শিখিয়া বঙ্গদেশে একজন অদ্বি-তীয় লোক হইয়াছিলেন। তিনি যেরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া লেখাপড়া অভ্যাস করিয়াছিলেন, ঐরূপ উদ্যম ও একাগ্রতা, থাকিলে, সকল অবস্থার লোকই বোধ হয় সংসারে প্রভূত অর্থ ও যশ সঞ্চয় করিতে পারে।

ইহাও অনেকে মনে করিয়া থাকে যে স্কুল-কলেজের পাঠ সমাপ্ত হইলেই লেখা পড়া শেষ হইল—বাল্যকাল অতীত হইলে, আর বিদ্যাভ্যাসের সময় থাকে না। কিন্তু দেখ, এই বিদ্যাসাগর যৌবনকালেও, চাকরী করিতে করিতেও, কেমন উত্তম বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। এই উদ্যম, এই অধ্যবসায়, এই কষ্টস্বীকার, এই একাগ্রতা তোমাদিগের জীবনে প্রদর্শিত হইলে, তোমারাও সুবিখ্যাত হইয়া জন্মভূমির মহোপকার সাধন করিতে পার এবং আপনার ও পরিবারবর্গের অশেষ সুখ ও মঙ্গলের হেতু হইতে পার।

বিদ্যাসাগরের অশেষ গুণ ছিল। তাঁহার ন্যায় কৃতজ্ঞ পুরুষ

অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। তিনি বাল্যকালে যাঁহার নিকটে সামান্য উপকারও পাইয়াছেন. সুযোগ হইলে, তিনি. তাঁহার মহোপকার সাধন করিয়াছেন। পাঠশালার পণ্ডিত হইতে উচ্চ-পদস্থ অনেক লোক তাঁহার এই কৃতজ্ঞতার ফলস্বরূপ মাসিক মাসাহারা প্রাপ্ত হইতেন। ফলতঃ একদিনও যে ব্যক্তি বিদ্যা-সাগরের উপকার করিয়াছে, যাবজ্জীবন বিদ্যাসাগর তাহার কিংবা তাহার পুত্রপৌত্রাদির সন্ধান করিয়া যথাসাধ্য. প্রত্যুপ-কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এই সকল মহৎগুণের কাহিনী শুনিলেও হৃদয়ে মহত্ত্বের সঞ্চার হয়। এই সকল মহৎগুণের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন হৃদয়ে প্রচুর আনন্দ, তেমনই. লোক-সমাজে প্রচুর সম্মান ও যশ লাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিঃস্বার্থপরতা, তাঁহার লোভশূন্যতা, তাঁহার দয়া, তাঁহার ন্যায়পরতা দেখিয়া প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণও তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন। সে কিরূপ সম্মান, নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত পড়িলে বুঝিতে পারিবে।

হেলিডে সাহেব যখন বঙ্গের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তখন তিনি সপ্তাহের মধ্যে প্রতি বৃহস্পতিবার বিদ্যাসাগরকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। এজন্য বিদ্যাসাগর প্রতি বৃহস্পতিবার ছোটলাটের বাটীতে গমন করিতেন। এক-দিন তিনি ছোটলাটভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, ছোট-লাটের সহিত দেখা করিবার জন্য বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত, পদস্থ, মান্যগণ্য. ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছেন। বিদ্যাসাগর তথায় গমন করিয়া চাপরাসীদ্বারা আপনার নামের টিকিট পাঠাইয়া দিলেন।

ছোটলাটের নিকটে টিকিট পাঠাইলে, চাপরাসী আসিয়া বলিল বিদ্যাসাগরকে ছোটলাটসাহেব যাইতে বলিয়াছেন। তাহা শুনিয়া উপস্থিত মান্যগণ্য ব্যক্তিবর্গ নিতান্ত লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইলেন এবং আপনাদিগকে নিতান্ত অপমানিত ও মনে করিলেন। কারণ অনেক সময় বসিয়া থাকিয়াও, তাঁহারা ছোটলাটের সাক্ষাৎলাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা ইহাতে এমনই মর্ম্মান্তিক কষ্ট অনুভব করিলেন যে, এইরূপ ব্যবহারের কারণ অবগত হইবার জন্য তাঁহারা ছোটলাট সমীপে এই কথা উপস্থিত করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া, ছোটলাট মহানুভব হেলিডে তাঁহাদিগকে বলিলেন—"আমি বিদ্যাসাগরের নিকট অনেক উপদেশ পাই এবং অনেক কার্য্য তদ্দারা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কারণ, বিদ্যাসাগর নিঃস্বার্থ ও দেশহিতৈষী, সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্। অন্য যাঁহারা আমার নিকট আগমন করেন, তাঁহারা প্রায়ই আপনাদিগের স্বার্থসাধনোদ্দেশেই আসিয়া থাকেন। এরূপ স্থলে বিদ্যাসাগরকে ইঁহাদের সকলের অপেক্ষাই আমি সম্মানার্হ মনে করি।" এই উচিত কথা শুনিয়া সকলেই আপন আপন দোষ গুণ বুঝিতে পারিয়া নিরস্ত হইলেন।

এখন দেখ, নিঃস্বার্থপরতায় কিরূপ সাংসারিক খ্যাতি ও প্রতিপত্তি আনয়ন করিতে পারে।

চন্দ্রশেখর রায়।

বাকরগঞ্জ (বরিশাল) জেলার সাহাজাদপুর নামে গরগণায় চন্দ্রশেখর রায় নামে একজন পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারী বাস করিতেন। এখন ইংরাজ-শাসনে দস্যু-তস্করের ভয় কমিয়া আসিয়াছে, তখন দস্যুগণ দূর স্থান হইতেও অস্ত্রাদি লইয়া জলপথে ও স্থলপথে আসিয়া গ্রামবাসীর অর্থ লুণ্ঠনপূর্ব্বক পলায়ন করিত। একদা এইরূপ একদল দস্যু গুপ্তবেশে চন্দ্রশেখর রায়ের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিল। তাহাদিগের উদ্দেশ্য, দিনের বেলা সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া রাত্রিকালে বাটী লুণ্ঠন করিবে। চন্দ্রশেখর রায় নিজে যেমন বলবান ছিলেন, তাঁহার অধীনে কয়েক জন পাইকও সেইরূপ বলবান ছিল। তখনকার জমিদারগণ বলবান ও লাঠিয়াল দেখিয়াই পাইক নিযুক্ত করিতেন। দস্যুগণ পূর্ব্বে চন্দ্রশেখর রায়ের নাম না শুনিয়াছিল এমন নহে—তাঁহাকে পরাক্রান্ত বলিয়াও তাহারা জানিত। তবু তাঁহার বাটী লুণ্ঠন করিতে তাহাদের বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল।

চন্দ্রশেখর রায় অতিথিপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে অতিথির বিশেষ সমাদর ছিল। দস্যুগণও বিশেষ সমাদর প্রাপ্ত হইয়া আহারাদি সমাপন করিল। এই আহারকালে চন্দ্রশেখর রায়ের একজন প্রাচীন ভৃত্য দেখিল যে, অতিথিগণ আহার্য্য-দ্রব্য মধ্যে কিছুমাত্র লবণ গ্রহণ না করিয়া, সেগুলি স্থানান্তরিত করিল। সেকালের লোকে জানিত, দস্যুগণ যে বাড়ীতে দস্যুতা করিবে, সে বাড়ীর নেমক তাহারা গ্রহণ করিবে না।

ইহা দেখিয়া তাহার মনে বিলক্ষণ সন্দেহ উপস্থিত হইল। প্রাচীন ভৃত্য তৎক্ষণাৎ এই কথা চন্দ্রশেখর রায়ের নিকটে নিবেদন করিল। শুনিয়া চন্দ্রশেখর রায় কিছুমাত্র ভীত বা চিন্তিত হইলেন না। তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত আত্ম-রক্ষার্থ সচেষ্ট হইলেন। তাঁহার বাটীর চারিপার্শ্বেই তাঁহার জমিদারী ছিল। তিনি সংবাদ দিয়া দেশস্থ বলবান প্রজা-গণকে একত্র করিলেন।

তখন বলবীর্য্য একটা বিশেষ গৌরবের বিষয় ছিল। চন্দ্র-শেখর গ্রামস্থ সকল লোককে তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রণ করিলেন। বহির্ব্বাটীতে এক বিস্তীর্ণ আস্তরণ বিস্তৃত হইল। গ্রামস্থ লোক তাহাতে উপবেশন করিলেন। সেই অতিথিবেশী দস্যু-গণও আমন্ত্রিত হইয়া তথায় উপবেশন করিল। চন্দ্রশেখর রায় তখন সর্ব্বসমক্ষে আপনার বলবীর্য্যের পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথমে তিনি তাঁহার পাইক সর্দ্দারগণের সহিত লাঠি খেলিতে লাগিলেন। লাঠি খেলা শেষ করিয়া চন্দ্রশেখর তাহা-দিগের সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি জমিদার, তাহারা নীচ লোক, এ ধারণা মন হইতে তখন দূর করিয়া, তিনি নিঃসঙ্কোচে তাহাদিগকে একে একে পরাস্ত করিলেন। পরে জয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া চন্দ্রশেখর সভাস্থ বলবান ব্যক্তিগণকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিলেন। সেই দস্যুদলের মধ্যে যাহারা বিশেষ বলবান ছিল, তাহারা সেই আহ্বানে শুনিয়া নিরস্ত থাকিতে পারিল না—তাহারা চন্দ্রশেখরের সঙ্গে একে

একে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল—চন্দ্রশেখর একে একে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া বিদায় করিলেন। তখন রোষে তাঁহার নয়নদ্বয় ঘোরতর রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল—তিনি পুনঃ পুনঃ সভাস্থিত লোকদিগকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাব শৌর্য্য ও বীর্য্য দেখিয়া কেহই আর অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। তখন তিনি হাসিয়া ক্রীড়াপ্রাঙ্গন হইতে অপসৃত হইলেন। লোক জন সকল আপন আপন আলয়ে প্রস্থান করিল।

তাঁহার এইরূপ বীর্য্যবত্তা দেখিয়া দস্যুগণ বিস্মিত, ভীত ও পুলকিত হইয়া গোপনে তাহাদিগের পরিচয় ও সেখানে আসিবার উদ্দেশ্য প্রকাশ করিল—এবং তাঁহার বলবিক্রমের প্রশংসা করিয়া নীরবে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

চন্দ্রশেখর ইচ্ছা করিলে, ইহাদিগকে গ্রেপ্তার করাইয়া শাস্তি দিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া এইরূপে বলবীর্য্য দেখাইয়াই আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মহম্মদ মসিন।

ইংরাজী ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী নগরে মহম্মদ মসিন নামক এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা, বদান্যতা ও ভোগাস্পৃহতারজন্য ইঁহার যশ বঙ্গদেশে অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে।

মহম্মদ মসিন শরীর ও মন উভয়েরই সাতিশয় উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। তিনি ব্যায়ামাদি দ্বারা শরীরকে এমনই বলশালী, কষ্টসহিষ্ণু, শ্রমপারগ করিয়াছিলেন যে, তৎকালে

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদৃশ পুরুষ অতি অল্পই পরিলক্ষিত হইত। তিনি বিনা ক্লেশে বহুদূর পদব্রজে ভ্রমণ করিতে পারিতেন, ফলতঃ এই পর্য্যটনক্ষমতাবলে তিনি সেই সময়ে পৃথিবীর নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া অশেষ জ্ঞানের ভাণ্ডার সঞ্চয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণা তাঁহাকে অল্পে কাতর করিতে পারিত না—কোন প্রকার দস্যুভয় তাঁহাকে সহজে বিচলিত করিতে পারিত না। অসিসঞ্চালনবিদ্যায়ও তাঁহার বিলক্ষণ পারদর্শিতা জন্মিয়াছিল।

অনেকস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, এইরূপ শারীরিক বল-বীর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তি প্রায়ই গোঁয়ার ও অস্থিরপ্রকৃতি হইয়া থাকে। তাহাদের মানসিক শিক্ষাও প্রায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু মসিন সেরূপ ছিলেন না। তিনি যেমন বলবান ও অসিসঞ্চালনকুশল ছিলেন, আরব্য ও পারস্য ভাষায় তেমনই তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য জন্মিয়াছিল।

মসিন যত্ন করিয়া মনোহারিণী কলাবিদ্যাও অভ্যাস করিতে বিমুখ হন নাই। চিত্রবিদ্যাতে তিনি সাতিশয় সিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার হস্তলিপি এমন সুন্দর ছিল যে, যে তাহা দেখিত, সেই প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিত না। মসিনের সময়ে হস্ত-লিপি সুন্দর হওয়া একটা গৌরবের কথা ছিল।

মসিন আজীবন কৌমার ব্রত প্রতিপালন করিয়াছিলেন। প্রথমে তাদৃশ সঙ্গতিপন্ন না হইলেও, পরে তিনি তাঁহার ভগিনী মন্নুজানের অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহাকে সামান্য ভোগসুখে আকৃষ্ট করিতে পারে

তাঁহারা পরের কোন প্রকার কষ্ট বা অসুবিধার কারণ দেখিতে পাইলেই তাহার প্রতিবিধানে যত্নপর হইয়া থাকেন।

দেশের এই অভাব দূরীকরণার্থ হেয়ার সাহেব যেরূপ চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন, যেরূপ অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে ও কৃতজ্ঞতায় হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। বস্তুতঃ এই সম্বন্ধে তাঁহার সাধনাও যেরূপ বিস্ময়কর, সিদ্ধিও সেইরূপ অপূর্ব্ব হইয়াছিল।

হেয়ার সাহেব প্রথমেই মনে করিলেন, দেশস্থ মান্যগণ্য ব্যক্তিদিগের সহিত পরামর্শ না করিয়া, তাঁহাদিগের সহানুভূতি আকষণ না করিয়া তিনি এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে, তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। সেই জন্য তিনি তখনকার দেশস্থ বড় বড় লোকের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে ঈশ্বরই সহায়তা করিয়া থাকেন। হেয়ার সাহেব বিনা বাধায় প্রথমতঃ আমাদের দেশস্থ সকল লোকের সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দেশস্থ লোকের সহানুভূতি পাইয়া তিনি মনে করিলেন, এ সম্বন্ধে রাজকীয় সাহায্যও নিতান্ত আবশ্যক। সেই জন্য তিনি কলিকাতা সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার হাইড্ ইষ্ট সাহেবের নিকটে এই বিষয়ের উল্লেখ করিলেন। ইষ্ট সাহেব অত্যন্ত সদাশয় পুরুষ ছিলেন। তিনি হেয়ার সাহেবের এই সদনুষ্ঠানে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। অবিলম্বে একটি উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ হইতে লাগিল। কিন্তু তখন আর একটি বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া হেয়ার সাহেবের এই কার্য্য পণ্ড করিতে উদ্যত হইল।

সেই সময়ে রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। দেশস্থ হিন্দুগণ ইহাতে তাঁহার প্রতি বিশেষ কোপাবিষ্ট হইয়া উঠিলেন। রামমোহন রায় প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের একজন অধ্যক্ষ থাকিবেন, পূর্ব্বে এরূপ স্থির করিতে হইয়াছিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের পর হিন্দুগণ এই আপত্তি উত্থাপন করিলেন যে, রামমোহন রায়ের সহিত বিদ্যালয়ের কোন সম্বন্ধ থাকিলে তাঁহারা সে সম্বন্ধে কোনপ্রকার সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইবেন না। এইরূপে বিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হইল। একদিকে রামমোহন রায়কে অধ্যক্ষ না করিলে তাঁহার অবমাননা করিতে হয়, এবং এই অবমাননায় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে প্রতিকূলতাও করিতে পারেন; অপর দিকে তাঁহাকে প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ করিলে হিন্দুগণ ইহার প্রতিকূলতা করিবেন; সুতরাং বিদ্যালয় স্থাপন প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিবে। বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগিগণের প্রায় সকলেই এই পরিণাম ভাবিয়া ম্রিয়মাণ হইলেন। কিন্তু মহাত্মা হেয়ার সাহেব ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। প্রকৃত ইংরাজের ন্যায় তিনি বিঘ্ন অতিক্রম করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি দেখিলেন, রামমোহন রায় সুশিক্ষিত লোক এবং তিনি প্রায় একা এক দিকে। তাঁহাকে কোন প্রকারে বুঝাইয়া স্থির করিতে পারিলে, অন্য দল হইতে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই। এই জন্য তিনি রামমোহন রায়কে প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। রামমোহন রায় অনুদারপ্রকৃতি ছিলেন না। তিনি স্বদেশের উপকারার্থ আপ-

নার অভিমান অতি তুচ্ছ মনে করিলেন, এবং অম্লান-বদনে প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন। তখন উদ্‌যোগ কার্য্যে পরিণত হইতে লাগিল। মহাত্মা হেয়ার সাহেব লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া স্কুল স্থাপনের জন্য অর্থসংগ্রহ করিতে লাগিলেন। নানা স্থলে সভা সমিতি হইতে লাগিল। দেশস্থ বদান্য ব্যক্তিগণ হেয়ার সাহেবের সদনুষ্ঠানে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এইরূপে খ্রীঃ ১৮১৭ অব্দের ২০শে জানুয়ারী কলিকাতার হিন্দুকলেজ প্রথম স্থাপিত হইল।

এই হিন্দুকলেজে শিক্ষালাভ করিয়া এ দেশস্থ বহুতর লোক দেশে প্রতিপত্তি ও প্রাধান্য লাভ করিয়া গিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ের স্থাপনেই এ দেশে ইংরাজী শিক্ষার ভিত্তিস্থাপন হয়, এমন বলা যাইতে পারে। সুতরাং এক প্রকারে মহাত্মা হেয়ারকেই এই ইংরাজী শিক্ষার প্রতিষ্ঠাতা বলিতে পারা যায়।

নানা প্রকারে দেশস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া, তাঁহাদিগের নিকট হইতে অর্থানুকূল্য লাভ করিয়া এবং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া হেয়ার সাহেব এই বিদ্যালয়ের স্থাপনা করিলেন। ইহাতে তাঁহার যত্ন, অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও সদনুষ্ঠানে মহতী প্রবৃত্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি ইহা করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই। তিনি এই বিদ্যালয় যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে, তজ্জন্য নিজের অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। তিনি বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণ জন্য, পটোলডাঙ্গায় তাঁহার যে ভূমি সম্পত্তি ছিল,

তাহার কিয়দংশ আহ্লাদসহকারে দান করিলেন। ঐ স্থানে বিদ্যালয়ের বাটী নির্ম্মিত হইল।

বিদ্যালয় স্থাপনা করিয়া হেয়ার সাহেব দেখিলেন, যে, এতদ্দেশে অধ্যয়নোপযোগী গ্রন্থেরও বিশেষ অভাব রহিয়াছে। দেখিবামাত্র হেয়ার সাহেব এ অভাব দূর করিতেও অদম্য উৎসাহসহকারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই জন্য এতদ্দেশে "স্কুলবুক সোসাইটী" নামে একটী সভা স্থাপিত হইল। বিদ্যালয়ের উপযোগী গ্রন্থসমূহ ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় প্রণয়ন ও সঙ্কলনপূর্ব্বক অতি অল্প মূল্যে বা স্থলবিশেষে বিনামূল্যে প্রচার করাই এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

ইংরাজীভাষা শিক্ষা করিয়া লোকে মাতৃভাষা বাঙ্গালা উপেক্ষা না করে, তজ্জন্য হেয়ার সাহেব নিজে ইংরাজ হইয়াও, যাহাতে এদেশের লোক বাঙ্গালা ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইতে পারে এবং বাঙ্গালা ভাষারও যাহাতে উন্নতি হয়, তজ্জন্য মনোযোগী ও যত্নপর হইলেন। ফলতঃ তাঁহার চেষ্টার ফলে আমাদের দেশে ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয়বিধ ভাষাশিক্ষারই বিশেষ বন্দোবস্ত হইতে লাগিল এবং দেশীয়গণ উভয়বিধ ভাষাতেই কৃতবিদ্য হইতে লাগিলেন।

হিন্দু কলেজ স্থাপন করিয়া হেয়ার সাহেব এতদ্দেশীয়দিগকে ইংরাজী প্রণালীমতে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য একটি কলেজ স্থাপন করিতে বিশেষ উদ্যোগী হইলেন। তৎকালীন গবর্ণর জেনেরল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সাহেব এ বিষয়ে পৃষ্ঠপোষক হইতে স্বীকৃত হইলেন। এইরূপে এতদ্দেশে মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হইল।

হেয়ার সাহেব এতদ্দেশীয়দিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ বিদ্যালয় স্থাপনা করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই। তিনি প্রকৃত অভিভাবকের ন্যায় শিক্ষার্থিগণের শিক্ষা ও চরিত্র পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তিনি প্রতিদিন বেলা দশটার সময়ে স্কুল ও কলেজ দেখিতে আসিতেন। তিনি স্কুলে আসিয়া ছাত্রগণের উপস্থিতি লিখিবার বহি পরীক্ষা করিতেন। যে সকল বালক অনুপস্থিত থাকিত, তিনি অবিলম্বে তাহাদিগের অনুসন্ধানে বহির্গত হইতেন। এই অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া যদি দেখিতে পাইতেন, বা জানিতে পাইতেন, কোন বালক শারীরিক পীড়ার জন্য বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে পারে নাই, তাহা হইলে তিনি তাহার জন্য ঔষধাদির ব্যবস্থা করিতেন, এবং আবশ্যক হইলে শুশ্রূষা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। যে সকল বালক বিদ্যালয়ে যাইবার কথা বলিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইত, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বিদ্যালয়ে গমন না করিয়া অন্য কোন স্থানে ক্রীড়া-কৌতুকের জন্য গমন করিত, তাহাদিগকেও তিনি অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিতেন। যদি তাহাদিগকে পাইতেন, বিবিধ সদুপদেশ প্রদানে তিনি তাহাদিগকে সুপথে আনিবার চেষ্টা করিতেন। ফলতঃ মহাত্মা হেয়ার সাহেবের প্রকৃত বাৎসল্য ও উৎকৃষ্ট তত্ত্বাবধানহেতু উচ্ছৃঙ্খল বালকগণকেও সংযত হইতে দেখা যাইত।

যে সাহেব দেখিলে বালকগণ ভয়ে শত হস্ত দূরে গমন করে —মহাত্মা হেয়ার সেই সাহেব হইলেও কোনও বালক তাঁহার নিকটে যাইতে সঙ্কুচিত হইত না। তিনি এমনই অকৃত্রিম

বাৎসল্যভাব প্রদর্শন করিতেন যে, তাহাতে বালকগণের ভয় করিবার কোন কারণ থাকিত না। ফলতঃ তাঁহার গৃহ, প্রায় সর্ব্বদাই শিশুগণে পরিবৃত থাকিত। হেয়ার সাহেব তাহাদিগকে লইয়া নিরন্তর পরম সুখে মগ্ন থাকিতেন।

সাহেবেরা যেমন পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকেন, এতদ্দেশের লোকেরা তেমন থাকিতে পারে না। হেয়ার সাহেব এতদ্দেশীয়দিগের এই পরিষ্কারপ্রিয়তা জন্মাইবার জন্যও কম চেষ্টা করেন নাই। তিনি এ জন্য যাহা করিতেন তাহা শুনিয়া তোমরা বিস্মিত হইবে। তিনি প্রতিদিন স্কুলের ছুটীর সময়ে একখানি তোয়ালে হাতে করিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতেন, এবং যে সকল ছাত্রকে তিনি অপরিষ্কৃত দেখিতে পাইতেন, অবিলম্বে ঐ তোয়ালে দ্বারা তিনি তাহাদিকে পরিষ্কৃত করিয়া দিতেন. ইহাতে তিনি কিছুমাত্র অপমান বোধ করিতেন না—এই কার্য্যে তাঁহার প্রভূত আনন্দের সঞ্চার হইত। তিনি হাসিতে হাসিতে মাতার ন্যায় শিশুগণের হাত মুখ মুছাইয়া দিয়া মুখচুম্বন করতঃ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিতেন।

এতদ্দেশীয় কোন লোক কোন প্রকার বিপদে পতিত হইয়াছে, এ সংবাদ শুনিতে পাইলে, হেয়ার সাহেব ক্ষণমাত্রও সুস্থির থাকিতে পারিতেন না। তিনি অবিলম্বে তাহার বাটীতে গমনপূর্ব্বক সবিশেষ শ্রবণ করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এক দিন বাগবাজারনিবাসী একটী ছাত্র জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়াছে, এই সংবাদ হেয়ার সাহেবের কর্ণগোচর হইল। যখন তিনি এ কথা শুনিতে পাইলেন, তখন

ঘোরতর বৃষ্টি হইতেছিল। কিন্তু সেই মহাপুরুষ তাহাতে কটাক্ষপাত না করিয়া অবিলম্বে একখানি সামান্য গাড়ী ভাড়া করিয়া সেই ছাত্রের গৃহে উপনীত হইলেন।

এই হেয়ার সাহেবের কাহিনী লিখিয়া শেষ করা যায় না। তিনি দয়াধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আপনার আপাতসুখ ও সম্মানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন না। করিবেনই বা কেন? যিনি পরোপকার-ধর্ম্মের রসাস্বাদন একবার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি তজ্জন্য সকলই বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইতে পারেন।

হেয়ার সাহেব এমনই মহাপুরুষ ও এতদ্দেশীয়দিগের উপকারী বন্ধু ছিলেন যে, কেহ কেহ তাঁহার স্নেহ, পরম পবিত্র মাতৃস্নেহের সহিত তুলনা করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। এমন দয়াশীল, পরোপকারী, কর্ম্মবীর বৈদেশিক অতি অল্পই এ দেশে দেখিতে পাওয়া যায়।

হেয়ার সাহেবের কাহিনী এই স্থলেই উপসংহার করিয়া তোমাদিগকে এ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিতে চাহি।

তোমাদিগকে আমি যে সকল স্বতঃসুখজনক বৃত্তির কথা বলিয়াছি, পরোপচিকির্ষা তাহার মধ্যে অন্যতম। হেয়ার সাহেব এই বৃত্তিলব্ধ সুখে সর্ব্বদাই মগ্ন থাকিতেন। তাঁহার শারীরিক বল ও কষ্টসহিষ্ণুতা এমনই ছিল যে, তিনি কষ্টসাধ্য ব্যাপারও অল্পায়াসে সম্পন্ন করিয়া পরোপকারের অসীম আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতেন। পরোপকার করিতে অর্থের প্রয়োজন, হেয়ার সাহেবের অর্থও যথেষ্ট ছিল। অর্থের সঞ্চয় করিয়া, মহামতি হেয়ার এইরূপে অতি শ্রেষ্ঠ সুখ সম্ভোগের অধিকারী হইয়াছিলেন।